মা
আমার
মা
আবদুল মান্নান তালিব

মা আমার মা

আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৬৯

২য় প্রকাশ
জমাদিউস সানি ১৪৩০
বৈশাখ ১৪১৬
মে ২০০৯

বিনিময় মূল্য : ৫০.০০

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MA AMAR MA by Abdul Mannan Talib. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shrishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 50.00 Only.

প্রথম কথা

সত্য ইস্পাতের চেয়ে মজবুত, তরবারির চেয়ে ধারালো। সত্যের গতি মানুষের তৈরি যে কোনো নভোযানকে হার মানাবে।

এ গল্পগুলিতে নিখাদ সত্যই বলা হয়েছে। আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাতের চাইতে বড় সত্য আর কী হতে পারে। সেখান থেকে ঘটনা ও বিষয়গুলি নেয়া হয়েছে এবং তাকে পেশ করা হয়েছে তারই মতো করে কিশোর উপযোগী ভাষায় ও আংগিকে।

এ সত্যগুলি কিশোরদের চরিত্রকে ইস্পাতের মতো মজবুত করে গড়ে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এই ইস্পাতের মজবুতী তার মধ্যে যে ধার সৃষ্টি করবে তা কাঁচকাটা হীরের জন্যও হবে ঈর্ষার বস্তু।

আল্লাহ আমাদের আগামীর প্রজন্মকে এই ঈর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী করুন।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা।
১৪-৯-২০০০

সূচীপত্র

খুবাইবের চেয়ে ভালো বন্দী দেখিনি

উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি হাদাত নামক একটি জায়গা।

পিছু নিয়েছে দু'শজন তীরন্দাজ একটি শত্রু দলের। তারা সবাই ইহুদী হুবাইল গোত্রের লেহ্ইয়ান বংশের টগবগে যুবক।

'শত্রুরা কারা?' একজন বললো।

'ঠিক জানি না,' দ্বিতীয়জন বললো। 'তবে ইয়াস্‌রিবের দিক থেকে তাদের আসতে দেখা গেছে।'

'শুনলাম সংখ্যায় তারা বেশী হবে না।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি।'

'তাহলে আমাদের এতো বড় তীরন্দাজ বাহিনীর কী দরকার ছিল?'

'বলা যায় না, যদি তারা মুহাম্মদের সহচর হয়, তাহলে তাদের চল্লিশ পঞ্চাশজনের সাথেও আমাদের দু'শজনের পেরে ওঠা কঠিন হবে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। আবার তারা এইমাত্র কিছুদিন আগে বদরের যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছে। ফলে তাদের বুকের পাটা দশ হাত বেড়ে গেছে। তাই সাবধানের মার নেই বলে আমরা বড় বাহিনী সংগে নিয়ে এসেছি।'

'সবাই থেমে যাও।' সামনের একজন জোরে চিৎকার করে উঠলো।

এই দেখো, এখানে কিছু সদ্য খাওয়া খেজুরের আঁটি পড়ে আছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে সবাই মিলে এখানে বসে খেজুর খেয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাইতো। এতো দেখছি ইয়াস্‌রিবের (মদীনা) খেজুর। পুরুষ্টু ও লম্বা আঁটি দেখে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। আমি হলফ করে বলতে পারি এগুলো ইয়াস্‌রিবের খেজুরের আঁটি। আর এরা সেই বিধর্মী, বদরের যুদ্ধে যারা মক্কার কুরাইশদেরকে পরাজিত করেছে।'

'তবে হ্যাঁ, এদের সংখ্যা যে আট-দশজনের বেশী হবে না তা এই খেজুরের আঁটিগুলোর পরিমাণ দেখলে বুঝা যাবে। এরা এখনো বেশী দূরে যায়নি। এখানে ধারেকাছেই আছে। চলো দ্রুত সামনের দিকে।'

শত্রুদের পদচিহ্ন ধরে অনুসরণকারী তীরন্দাজ দলটি এগিয়ে চললো।

হযরত আসেম ইবনে সাবেত আনসারী (রা) তীরন্দাজ দলটিকে দেখতে পেলেন। তিনি নিজের সাথীদেরকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে বললেন। তাঁরা ছিলেন মাত্র দশজন। বিশাল তীরন্দাজ বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার মতো অস্ত্রও তাঁদের কাছে ছিল না। কারণ, তাঁরা তো যুদ্ধ করার জন্য বের হননি। শত্রুদের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখার এবং সে সম্পর্কে সঠিক খবর সংগ্রহ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে মদীনা থেকে পাঠিয়েছিলেন। বিশেষ করে বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবার পর মক্কার কাফের মুশরিকরা চারদিকের মুশরিক গোত্রদের সাথে গোপন যোগাযোগ করছে। তাদের সাথে নানা ধরনের চুক্তি করছে। তাদের দলে টানতে চাচ্ছে। তাদের সাহায্য গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শত্রুদের এসব

গোপন যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর সংগ্রহ করা তো কোনো সশস্ত্র সেনাবাহিনীর কাজ নয়। বরং এটা একটা গোয়েন্দা বাহিনীর কাজ। যাদের কাছে আত্মরক্ষার জন্য কিছু হালকা ধরনের অস্ত্র থাকতে পারে। আজকের যুগের পদাতিক বাহিনীর দূরপাল্লার বড় অস্ত্র মেশিনগান ও মিসাইলের ন্যায় সে যুগে ছিলো তীরধনু। এই তীর সজ্জিত ছিলো বনু লেহ্ইয়ানের কাফের তীরন্দাজ বাহিনীটি। তারা মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করে মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করতে চাচ্ছিল।

'অস্ত্র ফেলে দাও, পাহাড় থেকে নেমে এসো' কাফেরদের দলনেতা চিৎকার করে বললো। 'আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদের কাউকে হত্যা করা হবে না।'

'আল্লাহর কসম, আমি আজ কোনো কাফেরের আশ্রয় নিয়ে পাহাড় থেকে নামবো না। হযরত আসেম পাহাড়ের উপর থেকে পাল্টা জবাব দিলেন। 'হে আল্লাহ! তোমার নবীকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দাও।'

হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহ আনহু পাহাড় থেকে নামতে অস্বীকার করলে কাফের বাহিনী পাহাড়ের চূড়ার দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলো। প্রতিবারে দু'শত তীর পাহাড়ের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত আসেমসহ সাতজন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁরা আসলে জান্নাতের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের ইপ্সিত বস্তু লাভও করলেন। তাঁরা সফলকাম হলেন।

বাকি রয়ে গেলেন আরো তিনজন সাহাবী। তাঁরা ছিলেন হযরত খুবাইব আনসারী (রা), হযরত ইবনে দাসেনাহ (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক বালওয়াই (রা)। তাঁরা পাথরের আড়াল নিতে পেরেছিলেন বলে সহজে কাফেরদের তীরের আওতায় এলেন না। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ থাকতে পারবেন ? কাফেররা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেই তো তাঁরা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবেন।

এ অবস্থায় তাঁরা কাফেরদের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে পাহাড় থেকে নেমে এলেন। তাঁরা কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে আসার সাথে সাথেই কাফেররা তাদের ধনুকের ছিলা খুলে নিয়ে তাঁদের বেঁধে ফেলতে লাগলো। কাফেরদের বেঁধে ফেলার তোড়জোড় দেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক বালওয়াই (রা) বলে উঠলেন,

'এই শুরু হলো প্রতিশ্রুতি ভংগের পালা। আল্লাহর কসম, আমি কখ্খনো তোমাদের সাথে যাবো না। তোমাদের তুলনায় বরং যারা আল্লাহর পথে প্রাণ দিয়ে গেলেন তাদের নীতিই আমার কাছে অনুসরণযোগ্য।'

কিন্তু কাফেররা তাঁর কোনো কথা শুনলো না। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি শুরু করে দিলো। তিনি এক কদম এগুতে রাজি হলেন না। ফলে তারা তাঁকে শহীদ করে দিলো।

এভাবে রসূলের (সা) আটজন সাহাবী শহীদ হলো। আর রয়ে গেলেন দু'জন। হযরত খুবাইব ও হযরত ইবনে দাসেনাহ্। তাঁদেরকে নিয়ে তারা মক্কায় বিক্রি করে দিলো।

বদরের যুদ্ধে হযরত খুবাইব (রা) মক্কার কুরাইশ নেতা হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। তাই হারেসের গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁকে কিনে নিলো।

হারেসের গোত্র হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে তাঁকে শৃঙ্খলিত করলো। তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করলো। একথা চারদিকে ঘোষণা করে দিলো। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে আজ ঘটনাক্রমে তাদের একজনকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে তারা। তাকেই হত্যা করে মনের আক্রোশ প্রতিহিংসার জ্বালাকে তবুও কিছুটা কমাতে পারবে তারা। হারেসের গোত্রে তাই উৎসবের ধুম পড়ে গিয়েছিল। এর ঢেউ কুরাইশদের অন্যান্য গোত্রেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। শত্রুদের একজনকে তারা হত্যা করবে। মনের সুখে হত্যা করবে। আহ্ কী আনন্দ!

হারেস গোত্রের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও চারদিকে লাফালাফি করছিল। কিন্তু হযরত খুবাইব ছিলেন নির্বিকার। তাঁর মনে কোনো চিন্তা বা ভয় ছিল না। তাঁর মনে হলো, আর বেশী দেরী তো নেই। আল্লাহর কাছে যেতে হবে। অনেক দিন সফরে থাকার কারণে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অনেক ময়লা জমে গেছে। বিশেষ করে অবাধ্যভাবে বেড়ে ওঠা কিছু চুল সাফ করা দরকার। তিনি হারেসের মেয়ে যয়নবকে বললেন ঃ

'আমাকে কি একটা ক্ষুর দেবে? আমি কিছু চুল কেটে ফেলবো।'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে যয়নব একটা ক্ষুর এনে তাঁর হাতে দিয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন।

যয়নবের ছিল একটি ছোট্ট ছেলে। সে হযরত খুবাইবের (রা) আশেপাশে খেলা করছিল। যয়নব সবসময় তার প্রতি নজর রাখতে পারছিলেন না। কখনো কখনো সে যয়নবের নজর এড়িয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছিল। কাজের মাঝখানে একটু ফাঁক পেতেই যয়নব ছেলের দিকে তাকালেন। কই ছেলে যেখানে খেলা করছিল সেখানে তো নেই। ছেলের সন্ধানে তিনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ খুবাইবের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠলো। তিনি দেখলেন খুবাইবের এক হাতে ধারালো ক্ষুর। ক্ষুরটি চকচক করছে। অন্য হাত দিয়ে তিনি যয়নবের ছেলেটিকে উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন।

ভয়ে যয়নবের চেহারার রং ফিকে হয়ে গেলো। তিনি জোরে চিৎকার দেয়ার কথাও ভুলে গেলেন। অথবা ভাবলেন চিৎকার দিলে যদি এখনই কিছু হয়ে যায়। ছেলেকে তো আর তাহলে ফিরে পাবেন না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন হযরত খুবাইবের দিকে। 'আমি জানি তুমি কি আশঙ্কা করছো', যয়নবের দিকে তাকিয়ে হযরত খুবাইব বলে উঠলেন। তোমার ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাবছো আমি বুঝি তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবো। না, না, একজন মু'মিনকে অতটা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও স্বার্থবাদী ভেবো না। আল্লাহর কসম, আমি কখনো তোমার ছেলেকে হত্যা করবো না।

এতক্ষণে যয়নবের মনে আশার সঞ্চার হলো। হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু ছেলেটিকে ছেড়ে দিলেন। সে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পরে মুশরিকরা হযরত খুবাইবকে হত্যা করার জন্য বাইরে নিয়ে গেলো। মৃত্যুর পূর্বে দু' রাকাআত নামায পড়ার জন্য তিনি তাদের কাছে সময় চাইলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ 'আমি আশঙ্কা করছিলাম, তোমরা মনে করবে হয়তো আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায লম্বা করছি। তাই আমি বেশী সময় নিয়ে নামায পড়লাম না।'

তারপর তিনি আবেগ রুদ্ধ স্বরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন ঃ 'হে আল্লাহ ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে গুণে হত্যা করো।'

'হে আমার রব ! আমি মুসলিম হবার কারণে প্রাণ দিতে যাচ্ছি। তাই কোন্ পাশে ফেলে আমাকে মারা হচ্ছে সেটা আমার জন্য কোনো ভাবনার বিষয় নয়।'

'এতো শুধু আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করার একটা উপায়। তিনি চাইলে শরীরের কর্তিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন প্রতিটি অংশেই বরকত দিতে পারেন।'

তারপর হারেসের পুত্র তাকে হত্যা করলো। হারেসের মেয়ে হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো আর কোনো বন্দী দেখিনি। আল্লাহর কসম ! আমি একদিন দেখলাম খুবাইবের হাতে একটি টসটসে আঙ্গুরের ছড়া। তিনি ছড়া থেকে আঙ্গুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। অথচ তখন মক্কায় ফলের কোনো মওসুম ছিলো না। আর তাঁর হাত-পাও ছিলো শিকলে বাঁধা।

যয়নব বলতেন, এ ছিল আসলে আল্লাহর রিযিক। আল্লাহ খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খাওয়াতেন।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

'যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা বেঁচে আছে এবং জীবিকা লাভ করছে তাদের রবের কাছ থেকে।'

হযরত খুবাইব (রা) আল্লাহর পথে আল্লাহর জন্য জীবন দিয়েছিলেন। তাঁর শাহাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি লাভ করেছিলেন আল্লাহর নৈকট্য। তাই শাহাদাত লাভের পূর্বক্ষণ থেকে আল্লাহ তাঁকে রিযিক দান করছিলেন।

সত্যের সন্ধানে
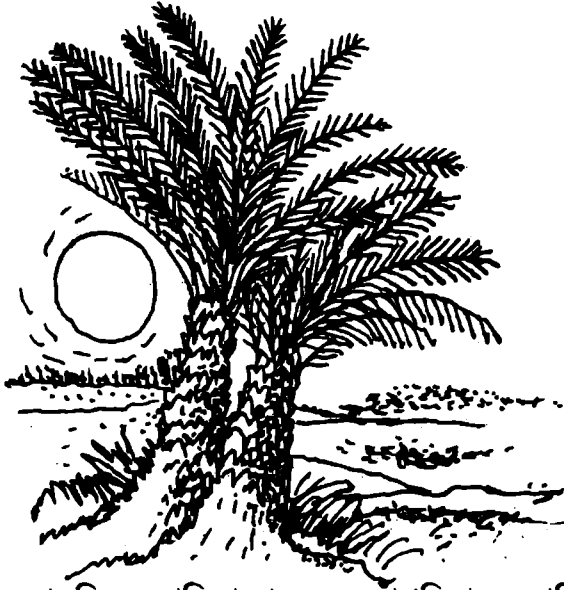
আমি ছিলাম গাছের ওপর।

নিচে ছিলো আমার ইহুদী মনিব।

খেজুরের ডাল ধরে কাঁদি থেকে পাকা খেজুর পাড়ছিলাম। এমন সময় আমার কানে এলো সেই কথাগুলো। আমার সারা শরীর যেনো অবশ হয়ে আসছিল। আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। আমি গাছ থেকে পড়ে যাবো নাকি। আহ্ কী শুনলাম! যে আশা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম আজ কত বছর হয়ে গেলো! সেই বহুদূর ইরানের ইস্‌পাহান থেকে সিরিয়া। সেখান থেকে মুসেল। মুসেল থেকে নাসিবীন। সেখান থেকে আমূরীয়া। আর আমূরীয়া থেকে আজ এ মদীনায়। সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার যে বুকভরা আকাঙ্খা নিয়ে ঘর ছেড়েছিলাম তা বুঝি এখন পূর্ণ হতে চলেছে। নিচে দাঁড়িয়ে আমার মনিবের ভাই বলছিলো ঃ

ভাই সাহেব, আপনি কিছু শুনেছেন?

কি ব্যাপার, কই আমি তো কিছুই শুনিনি। আরে বনি কাইলাদের ব্যাপারে আপনি শুনেননি বুঝি? কুবায় এসেছেন মক্কার একজন মুসাফির। তাঁর সঙ্গী রয়েছেন আরো কয়েকজন। আল্লাহ মালুম কে এই লোক! কিন্তু তিনি দাবী করছেন তিনি আল্লাহর রসূল। তাঁর কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আর না জানি আরো কত কি কথা। বনি কাইলার লোকেরা তাঁকে যে কি পরিমাণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করছে তা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এদিকে শহর থেকেও লোকেরা দলে দলে যাচ্ছে। তাঁর চারদিকে ঘিরে বসছে। তাঁর কথা শুনছে। সে এক অভাবনীয় কাণ্ড।

যতই শুনছিলাম ততই আমার শরীরের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমি আমার ইহুদি মনিবের মাথার ওপর চিৎপটাং হলাম। এ অবস্থায় বেদিশা হয়ে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামতে শুরু করলাম। আমি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলাম। তাড়াহুড়োর মধ্যে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

হুজুর, আপনি কি যেন বলছিলেন, আর একবার বলুন না।

আমার সাহস দেখে আমার ইহুদি মনিব বড়ই নাখোশ হলেন। তিনি রেগেও গেলেন। সজোরে একটা ঘুঁষি চালালেন আমার ঘাড়ে। ধমক দিয়ে বললেন, যা যা ব্যাটা, এতো কথায় তোর কি কাজরে, নিজের কাজ কর।

কিন্তু এখন তো আমার আর মনেও নেই যে, তিনি আমার মনিব এবং আমি তার কেনা গোলাম। তাই আমি বড়ই শান্তভাবে মনিবের মুখোমুখি হয়ে বললাম, আমি আপনাদের কথা ভালো করে শুনতে চাচ্ছিলাম। কে সেই মহান ব্যক্তি কুবায় এসেছেন, কার আসার সুসংবাদ শুনছিলাম।

যাই হোক, সেদিন ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াতে দিলেন না আমার মনিব। কিন্তু আমার সমস্ত সত্তা সজাগ হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ছিল আমূরীয়ার মৃত্যুশয্যায় শায়িত সেই বৃদ্ধ যাজকের শেষ নসিহত ঃ

'হ্যাঁ, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। আমি তো চলে যাচ্ছি, তবে যদি আল্লাহ চাহে তো তুমি সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আল্লাহর শেষ নবীর আগমনের সময় একেবারে কাছে এসে গেছে। তাঁর জন্ম হবে আরব দেশে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীনের তিনি হবেন অনুসারী। কিছুকাল নিজের শহরে অবস্থান করবেন। লোকদের আল্লাহর দীনের তালীম দেবেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে কুফরী ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু শহরের দুর্ভাগা লোকেরা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দেবে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। তারপর তিনি হিজরত করে এমন এক শহরে চলে আসবেন যার দু' দিকে দু'টো কালো পাহাড়। আর এই পাহাড় দু'টোর মাঝখানে আছে বহু খেজুর বাগান। এ নবীর কিছু নিশানী আছে, যা একেবারেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তাঁর তিনটি বড় বড় নিশানী হচ্ছে ঃ

এক. তিনি সাদকা খান না।

দুই. তিনি হাদীয়ার সামগ্রী খান।

তিন. তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর আছে।'

আমার সেই বৃদ্ধ ধর্মগুরুর কথা এখনো আমার কানে বাজছিল ঃ 'প্রিয় বৎস ! ভাগ্য যদি তোমার সহযোগী হয়, তাহলে তুমি অবশ্যই তাঁর খেদমতে পৌঁছুবে।'

উহ্, এখন আমার কী যে খুশী লাগছিল ! আজকের সারাটা দিন কিভাবে কেটে গেলো তা যেন টেরই পেলাম না। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এলো। সারাদিন ছিল আমার কাজ। রাতের বেলা বিশ্রাম। কাজেই রাতে আমি একটা পোটলায় কিছু খাবার বেঁধে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম কুবার পথে। আমার পরম পুরুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর নুরানী চেহারা দেখে মন ভরে গেলো। তাঁর চারপাশে সবাই বসে আছে, আমিও বসে পড়লাম। আমার খাবার সামগ্রী তাঁর সামনে রেখে বললাম ঃ

'হযরত ! শুনলাম আপনি মক্কা থেকে এসেছেন। আপনার সাথে আরো কয়েকজন মুসাফিরও আছেন। আমার কাছে এই কিছু সাদকার সামগ্রী ছিল। আমি ভাবলাম, আপনার চেয়ে বেশী আর কে এর হকদার হবে। তাই আপনার জন্য নিয়ে এলাম। নিন গ্রহণ করুন।'

তিনি আমার হাত থেকে সব সামগ্রী নিয়ে নিলেন এবং তাঁর সাথীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। কিন্তু নিজে এক টুকরাও মুখে দিলেন না। আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম। যাক আল্লাহর শোকর, প্রথম নিশানী মিলে গেছে। কিছুক্ষণ বসে তাঁর কথা শুনতে থাকলাম। যতই শুনি ততই মন জুড়িয়ে যায়। আহ্ কী প্রশান্তি ! কিন্তু আমাকে তো চলে আসতে হবে। আমি তো স্বাধীন নই। ইহুদীর গোলাম। কাজেই কিছুক্ষণ পরে আমাকে চলে আসতে হলো।

এখন দিনরাত আমার শুধু একটাই ধান্দা, কিভাবে তাড়াতাড়ি আবার তাঁর সামনে হাজির হবো। এ ফিকিরে ক'দিনের মধ্যে কিছু খাবার জিনিস সংগ্রহ করলাম। একদিন সন্ধ্যা হতেই আবার রওয়ানা দিলাম। তখন তিনি কুবা থেকে মদীনায় চলে এসেছিলেন। সামনে হাজির হয়েই আমি খাবার সামগ্রীগুলো পেশ করে বললাম, গতবারে কিছু সাদকার সামগ্রী এনেছিলাম কিন্তু আপনি খাননি। তাই

এবার কিছু হাদীয়া আপনার জন্য এনেছি। এগুলো গ্রহণ করুন। তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। নিজে খেলেন এবং অন্য সাথীদেরকেও দিলেন। এ দৃশ্য দেখে আমার মন খুশীতে ভরে গেলো। ভাবলাম, আল্লাহ আল্লাহ করে দু'টো তো মিলে গেলো, এখন বাকি রইলো তৃতীয়টা। সেটাও সুযোগ মতো যাচাই করে দেখতে হবে।

তৃতীয়বার আমি যখন তাঁর খেদমতে হাজির হলাম তখন তিনি বাকিউল গারকাদে কোনো সাথীর জানাযায় শরীক ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল পাগড়ী। জানাযা শেষে তিনি সঙ্গী-সাথীদের মাঝখানে বসেছিলেন। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। কিন্তু এবারে সবার সাথে বসার চেষ্টা না করে তাঁর চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকলাম। চেষ্টা করছিলাম কোনোভাবে তাঁর পিঠের ওপরের দিকটা দেখা যায় কিনা। মোহরে নবুওয়াত দেখে আমার কলিজা ঠাণ্ডা করতে চাচ্ছিলাম।

আমাকে চারপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মতলব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। চাদরটাকে ঘাড়ের কাছ থেকে একটু নিচে নামিয়ে দিলেন। আমি তো অপেক্ষায়ই ছিলাম। নবুওয়াতের মোহর নজরে পড়তেই আমি আর নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারলাম না। চুম্বক যেন লোহাকে টেনে নিয়ে গেলো। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখতে লাগলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠে আঁকা নবুওয়াতের মোহর। আমার দু' চোখ পানিতে ভিজে গেলো। আনন্দের আতিশয্যে আমি নবুওয়াতের মোহরে চুমো দিতে লাগলাম। এদিকে চোখ দিয়ে পানিও গড়াচ্ছিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখতে থাকলেন নিরবে। তারপর গভীর স্নেহে ডাক দিলেন, সালমান ! এদিকে ফেরো। তোমার ব্যাপার কি শুনি। আমি সামনে এসে দু' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। তাঁকে শোনাতে লাগলাম আমার চমকপ্রদ সফরের সুদীর্ঘ কাহিনী ঃ

পারস্যের ইসপাহানের একটি গ্রামে আমার জন্ম। পিতা ছিলেন কৃষক। আমি ছিলাম তাঁর সবচেয়ে আদরের সন্তান। অত্যধিক স্নেহের কারণে কুমারী মেয়েদের মতো আমাকে সবসময় আগলে রাখতেন। ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না। আমাদের গৃহে ছিল একটি 'অগ্নিকুণ্ড'। তাতে সবসময় আগুন জ্বলতো। তার আগুন কখনো নিভতো না। আমরা ছিলাম অগ্নিপূজারী। আগুন জ্বালানোই ছিলো আমাদের

ইবাদত। আর আমি শিশুকাল থেকেই ছিলাম ধর্মপ্রিয়। তাই সর্বক্ষণ আমি আগুন জ্বালানোর ইবাদতে লেগে থাকতাম। আমাদের দেশে যেসব ধর্মীয় লোক আগুন জ্বালাবার কাজে লিপ্ত থাকে তাদেরকে বলা হয় কুতন। আমাকেও 'কুতন' বলা হতো।

এভাবে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আমি বড় হয়ে উঠছিলাম। বহুদিন পরে ঘটনাক্রমে একদিন ঘরের বাইরে বের হবার সুযোগ পেয়ে ঈসায়ীদের গীর্জায় একদল লোকের শোরগোল করে নিরাকার আল্লাহর ইবাদত করতে দেখে আমার তা খুব ভালো লাগলো। আমার মনে হলো আমাদের ধর্মের চেয়ে এ ধর্মটাই ভালো। তাই আল্লাহর সঠিক ইবাদত করার সংকল্প নিয়ে আমি একদিন পরিবারের সবার চোখ এড়িয়ে ঈসায়ীদের কেন্দ্র সিরিয়ার বড় পাদরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। তাঁর খেদমতে থেকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পাদরীর ধূর্তামী ও লোভ আমার কাছে ধরা পড়লো। দেখলাম তিনি লোকদেরকে গরীবদের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে বিপুল পরিমাণ সোনাদানা গোপনে আত্মসাত করে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তার মৃত্যুর পর আমি এ তথ্য জনগণের সামনে ফাঁস করে দিলাম। তার গোপন ভাঁড়ারে সংগৃহীত সাতটি কলসি ভরা সোনা ও রূপা লোকদেরকে দেখিয়ে দিলাম। ক্ষিপ্ত জনতা এ ভণ্ড পাদরীর জানাযা না পড়ে তার লাশ পুড়িয়ে ফেললো।

তারপর লোকেরা একজন নেককার পাদরীকে তার স্থানে বসালো। আল্লাহর এ নেক বান্দার সেবায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে অচিরেই তাঁর মৃত্যুর ফরমান এসে গেলো। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমি তাঁর কাছে আরজ করলাম, 'হযরত ! আপনি আমাকে দীন শিখিয়েছেন, সঠিক ইবাদাত করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এখন আপনি চলে যাচ্ছেন, আমি কার কাজে আল্লাহর দীনের শিক্ষা লাভ করবো বলে দিয়ে যান।'

বৃদ্ধ পাদরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বললেন, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি তোমাকে কার কাছে পাঠাবো। লোকদের অবস্থার দিকে তাকালে আল্লাহওয়ালা একজন লোকও পাওয়া যাবে না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে সাচ্চা দীন এনেছিলেন তা আজ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেছে। লোকেরা নিজেদের খাহেশাতের পেছনে ছুটছে। তবে হ্যাঁ, মুসেল শহরে আল্লাহর এক বান্দা আছেন, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের সঠিক অনুসারী। তুমি তার কাছে যাও।'

কিছুদিনের মধ্যে আমি মুসেলে গিয়ে সেই পাদরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর এ নেক বান্দাও শিগ্‌গীর দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আমি আবার সেই মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হলাম। তবে মৃত্যুর আগে আমার সম্মানিত ধর্মগুরুর কাছে আরজ করায় তিনি বহু চিন্তা-ভাবনার পর আমাকে নাসিবীন নগরীর প্রধান ধর্মযাজকের সন্ধান দিলেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর মুসেল থেকে বের হয়ে আমি নাসিবীন পৌঁছে গেলাম এবং সেখানকার প্রধান ধর্মযাজকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলো এবং তাঁর কথামতো আমি আমূরীয়ায় চলে গেলাম। সেখানকার প্রধান বিশপের খেদমতে থেকে আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকলাম।

কিন্তু সবই আল্লাহর ইচ্ছা। একদিন তাঁরও মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেলো। আমি অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে তাঁকে বললাম, 'হযরত ! আমি আল্লাহর সঠিক দীনের সন্ধানে কিশোর বয়সে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের অলক্ষ্যে গৃহ ত্যাগ করেছিলাম। তারপর যে ধর্মগুরুর কাছে ঠাঁই নিয়েছি কিছুদিন পরে তিনিই আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। শেষে আপনার কাছে এলাম। এখন আপনিও চলে যাচ্ছেন। যাবার আগে আমাকে নসিহত করে যান, আপনার পরে আমি আল্লাহর সঠিক দীন শেখার জন্য কার কাছে যাবো। তিনি অনেকক্ষণ নিরব থাকার পর অত্যন্ত স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন ঃ

'প্রিয় বৎস ! আল্লাহর কসম, এখন আর এই দুনিয়ায় একজন লোকও নেই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের সাচ্চা অনুসারী। এখন আমি তোমাকে কার কাছে পাঠাবো ! হাঁ, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। আমি তো থাকবো না। তবে আল্লাহ চাহে তো তুমি সৌভাগ্যের জামানা পাবে।' তিনি আমাকে আরবে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং এই সঙ্গে জানিয়েছিলেন তাঁর তিনটি নিশানী।

আমার এই প্রিয় ধর্মগুরুর ইন্তিকালের পর আমি সুযোগ মতো এক কাফেলার সাথে আরব দেশে এলাম। কিন্তু এ কাফেলার লোকেরা ওয়াদিউল কুরায় পৌছার পর আমার মালমাত্তা সব নিজেদের কব্জায় নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে এক ইহুদির হাতে বিক্রি করে দিলো। কিছুদিন পর এই ইহুদির এক চাচাত ভাই মদীনা থেকে এসে আমাকে কিনে নিয়ে মদীনায় চলে এলো। আমি তারই খেজুর বাগান দেখাশুনা করি। সারাদিন কাজ করি এবং রাতে আল্লাহর বন্দেগী করি। এখন আল্লাহর অসীম মেহেরবানি, তিনি আমাকে ঈমান ও ইসলামের সম্পদ দান করেছেন।

আমার এখন একটিই চিন্তা, কি করে ইহুদির গোলামীমুক্ত হবো এবং নিজেকে একমাত্র আল্লাহর গোলামীতে সোপর্দ করে দেবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তাঁর পরামর্শ মতো ইহুদি মালিকের সাথে চুক্তি হলো, আমি তাকে চল্লিশ আওকিয়া সোনা দেবো এবং তিনশ' খেজুর চারা তার বাগানে লাগিয়ে দেবো। খেজুর গাছে ফল ধরলে আমি মুক্ত হয়ে যাবো। আমার ইসলামী ভাইরা যখন একথা শুনলেন, তারা সবাই চাঁদা তুলে চল্লিশ আওকিয়া সোনা এনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তুলে দিলেন। এদিকে আমি তিনশ' খেজুর চারা আনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মুবারক হাতে সে চারা লাগিয়ে দিলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে এক বছরেই খেজুর গাছগুলোয় ফল ধরলো। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিকে সোনা আদায় করে দিয়ে আমাকে মুক্ত করে নিলেন।

এখন আমি সবসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতে থাকি। তাঁকে দেখে আমার চোখ শীতল করি এবং তাঁর কথা শুনে হৃদয় আলোকিত করি। আর তাঁর নির্দেশ মতো জীবন যাপন করে নিজের ইহকাল ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করি।

রসূলের প্রিয়পাত্র তিনি

'উসামাকে আমার দ্বিগুণ দেয়া হচ্ছে কেন ?'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হলো। মনের এ ক্ষোভ তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠলো। মুখ ফুটে তিনি একথা সবার সামনে বলেও ফেললেন।

সবাই মানে সবার আগে ছিলেন তাঁর পিতা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

ব্যাপারটি ছিল তখনকার দিনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তখন হযরত উমরের শাসনকাল। মুসলমানরা একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করছিল। যুদ্ধের ময়দানে এবং বিজিত দেশের শত্রুদের কাছ থেকে পাওয়া অনেক ধন-রত্ন তখন প্রায়ই মদীনায় আসছিল। একে বলা হতো মালে গনীমত। এ ধন-রত্নের পাঁচ ভাগের চার ভাগ পেতো যুদ্ধরত সৈনিকরা। এর বাকি এক ভাগ আসতো রাজধানীতে বায়তুল মালে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করা হতো।

এবারের মালে গনীমতের যে অংশ মদীনায় এলো, খলিফা হযরত উমর নিজেই তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। তাঁর নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহকে যা

দিলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে দিলেন তার দ্বিগুণ। আবদুল্লাহ এতে আপত্তি জানালেন। কারণ, তিনি জানতেন দীন ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার ত্যাগ ও কুরবানীর ভিত্তিতেই এ অর্থ বন্টন করা হয়। তাঁর মনে শঙ্কা জাগলো, হয়তো ইসলামে তাঁর মর্যাদা কম। অথচ তাঁর আশা ছিল ইসলামের খাতিরে তিনি এ পর্যন্ত যে আর্থিক ও শারীরিক কুরবানী দিয়েছেন তা কবুল করা হয়েছে এবং এর ফলে ইসলামে তাঁর মর্যাদা বেড়ে গেছে।

আবদুল্লাহ খলীফাকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন অনেক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি যেগুলোতে উসামা তাঁর সঙ্গে ছিল না। এরপরও মালে গনীমত বন্টন করার ক্ষেত্রে আপনি উসামাকে আমার চেয়ে বেশী দিচ্ছেন ?'

পুত্রের কথা শুনে খলীফা জবাব দিলেন, উসামা ইবনে যায়েদ তোমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক প্রিয়পাত্র ছিল। আবার উসামার পিতা যায়েদ ইবনে হারেস তোমার পিতার তুলনায় রসূলের বেশী প্রিয়পাত্র ছিল।' আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত যায়েদ ও তাঁর পুত্র উসামার এ মর্যাদার কারণ কি ? জাহেলিয়াতের যুগে নবী পত্নী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা শিশু অবস্থায় মক্কার বাজার থেকে যায়েদকে কিনে এনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেন। তাঁর কোনো পুত্র ছিল না। তিনি তাকে পালকপুত্র হিসেবে লালন-পালন করেন। কিছুকাল পরে পুত্রের খোঁজ পেয়ে ইয়ামন থেকে যায়েদের পিতা এসে তাকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু যায়েদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহার স্নেহ ও আদর উপেক্ষা করে পিতার সাথে চলে যেতে রাজি হননি। ফলে তিনি মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে যান। পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখন বিনা প্রশ্নে কালবিলম্ব না করেই হযরত যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীর স্নেহ, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের হযরত যায়েদ যথার্থ মূল্য দেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা তার প্রতি আরো গভীর হয়। যায়েদের পুত্র উসামাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতবেশী ভালোবাসতেন যে, ছোটবেলায় তাকে কাঁধে করে নিয়ে ফিরতেন।

হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু দেখতে তেমন সুপুরুষ ছিলেন না। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, হযরত উসামার গায়ের রং ছিল কালো। নাক চ্যাপ্টা ছিল। কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য বা অন্য কোনো পার্থিব সম্পদের মাধ্যমে ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করা হয় না। এখানে মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। যে আল্লাহকে যত বেশী ভয় করে, ইসলামে এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ততবেশী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর কিছু বান্দা আছে, তাদের চুল উস্কুখুস্কু, চেহারা মলিন ধূলিধূসরিত এবং কাপড়-চোপড় ছিন্ন ও পুরাতন। এজন্য তাদেরকে গুরুত্ব ও মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। কিন্তু তারা আল্লাহর বড়ই প্রিয়পাত্র। তারা কোনো ব্যাপারে কসম খেলে আল্লাহ তাদের কসম পূর্ণ করেন। এ থেকে বুঝা যায়, ইসলামে বাইরের চেহারা ও শোভা-সৌন্দর্যের তুলনায় ভেতরের আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁদের হুকুম পালনের ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়ারই গুরুত্ব বেশী। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এদিক দিয়েই ছিলেন মর্যাদার অধিকারী।'

মক্কা বিজয়ের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর উটের পেছনে বসেছিলেন হযরত উসামা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন মক্কায় ছিলেন এবং যখনই তওয়াফ করার জন্য বাইতুল্লাহ শরীফে যেতেন, তখনই তাঁর ডানে বামে থাকতেন হযরত বেলাল ও হযরত উসামা। তাদের বাইরের রং কালো হলেও ভেতর ছিল আলোয় আলোময়। আর এ কারণে ইসলামে তাদের মর্যাদা ছিল বেশী।

হযরত উসামার বয়স যখন ছিল বিশ বছরেরও কম তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি বড় সেনাবাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করেন। এ সেনাবাহিনীতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো মহান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীগর্ণ সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। উসামার মতো কম বয়সী যুবককে একটি বড় সেনাদলের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করায় বড় ও প্রবীণ সাহাবীগণ একটু অবাকই হয়ে গেলেন। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে গেলো। তখন তিনি সবাইকে আহ্বান করে মসজিদে নববীতে গেলেন। মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন ঃ 'উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করায় কেউ

কেউ আপত্তি করছে। এর আগে উসামার পিতা যায়েদকে সিপাহ্সালার নিযুক্ত করায়ও আপত্তি এসেছিল। অথচ যায়েদও জন্মগত সিপাহ্সালার ছিল উসামারই মতো। আর যায়েদের পরে সকল পুরুষের মধ্যে উসামা আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়। আমি চাই সবচেয়ে বেশী সৎলোক যারা, উসামা তাদের মধ্যে গণ্য হোক। কাজেই তোমরা তার মঙ্গল কামনা করো।'

উসামা তাঁকে ভালোবাসতেন, তিনি উসামাকে ভালোবাসতেন। উসামা ছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্র।
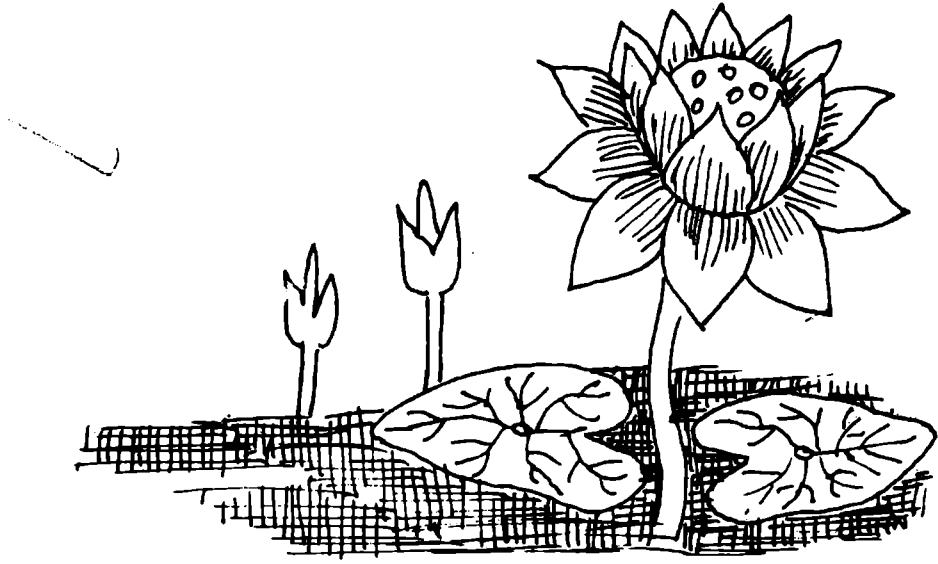
মুসলমানের আল্লাহ্ ভরসা

'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' —উচ্চরবে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আযান। সুস্পষ্ট নিনাদে আযানের প্রত্যেকটি বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, তাঁর জল্লাদ গানীসা এবং উপস্থিত সবাই তার জবাব দিয়ে চলছিলেন।

মাগরিবের আযানের আহ্বান জানিয়ে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নিরব হলো। মুসলমানরা মসজিদমুখী হলো। মাগরিবের আযান ও নামাযের মধ্যে বেশী ফাঁক দেয়া হয় না। তাই যার যার কাজ মুলতবী রেখে বা সেদিনের মতো শেষ করে সবাই দ্রুত যেতে থাকে মসজিদের দিকে। আর আযান মানেই মুসলমানের আল্লাহর সামনে হাজিরা দেবার ডাক। এ ডাকে কোনো মুসলমান চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাকে সাড়া দিতেই হয়। সে যে একমাত্র আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর হুকুমকে সে সবার হুকুমের উর্ধে স্থান দেয়, দুনিয়ার যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাক না কেন সবকিছুকে আল্লাহর হুকুমের কাছে সে তুচ্ছ মনে করে—একথা প্রমাণ করার জন্য সে সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে দ্রুত আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যায়। তাই হাজ্জাজও তার জল্লাদ গানীসাকে হুকুম দিলেন ঃ

'ওই শেষ কয়েদীটাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। ওকে তোমার হেফাজতে দিলাম। আগামীকাল সকালে সূর্য ওঠার পর আজকের এই স্থানে যেখানে সবকটা বিদ্রোহীর শিরচ্ছেদ করা হলো, ওরও শিরচ্ছেদ করা হবে।'

নামাযের পর হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে গানীসা চলছে তার কয়েদীকে নিয়ে গৃহের দিকে।

'ভাই গানীসা' কয়েদী বললো, 'তুমি কি আমার কথা শুনছো ?'

কেন, কি কথা ?'

'আমি নিরপরাধ। আমি ওই বিদ্রোহী দলের সাথে ছিলাম না।'

'জান বাঁচাবার জন্য সবাই ওকথা বলে।'

'না ভাই তুমি বিশ্বাস করো, আমাকে ভুল করে হাজ্জাজের সৈন্যরা পাকড়াও করেছে। আমি তোমার কাছে সদাচার প্রত্যাশা করি।'

'অবশ্যই আল্লাহ তওফীক দিলে আমি সদাচার করতে মোটেই কুণ্ঠিত হবো না।'

'আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তিনি আমাকে বাঁচাবেন। আমাকে এরা পথে গ্রেফতার করেছে। আমি বাড়িতে যেতে পারিনি। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার কিছু অসিয়ত আছে, তাদেরকে তা জানিয়ে আসতে পারিনি।'

'সে কথা এখন চিন্তা করে লাভ কি ? এখন আগামীকালের চিন্তা কারো।'

'আগামীকাল যা হবে তা তো আল্লাহর হাতে। এখন আমার দায়িত্ব হচ্ছে একটি বারের জন্য বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে অসিয়ত করে আসা। নয়তো কাল কিয়ামতে আল্লাহর সামনে আমাকে আসামী রূপে হাজির হতে হবে। তুমি একজন মুসলমান ভাই হিসেবে আমাকে এতটুকু সাহায্য করো। আমার ওপর তুমি পুরোপুরি ভরসা করতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি, আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই আমি বধ্যভূমিতে গবর্নর হাজ্জাজের সামনে হাজির হয়ে যাবো। তখন ঠিক সময় মতো আমার শিরচ্ছেদ করতে তোমাকে একটুও বেগ পেতে হবে না।'

গানীসার কি মনে হলো তার কথা শুনে ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হাসলো। কয়েদী আবার তার আবেদনের পুনরাবৃত্তি করলো। গানীসা একবার ভাবল, দিই তাকে ছেড়ে। এতই যখন বলছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আগামীকাল ঠিক সময় মতো সে ফিরে আসবে। তাই নিশ্চিত হবার জন্য সে বললো ঃ 'ঠিক বলছো, আগামীকাল ঠিক সূর্য ওঠার আগে এখানে হাজির হয়ে যাবে ? তাহলে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলো।'

'ওয়াল্লাহ্ আল্লাহর নামে কসম করে বলছি আগামীকাল ইনশাআল্লাহ সূর্য ওঠার আগেই আমি এখানে পৌঁছে যাবো।'

'গানীসা আল্লাহর ভরসায় কয়েদীকে মুক্ত করে দিলো। কিন্তু কয়েদী চলে যাবার পর এখন তার মনে হলো কাজটা কি ঠিক করলাম? একজন অজানা-অচেনা লোক, তাও আবার মৃত্যুদণ্ডের আসামী। তাকে মুক্তি দিলাম আগামীকাল সে ফিরে এসে তলোয়ারের নিচে মাথা পেতে দেবে এই ভরসায়। এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হলো? প্রাণের ভয়ে সে নিশ্চয়ই আর এদিকে ফিরে আসবে না। তার বদলে হাজ্জাজ তখন আমার গর্দানে তলোয়ার চালাবে। একথা মনে হতেই ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো। ঘরে ফিরে স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বললো।

'হায়, হায়, তুমি নিজের একি সর্বনাশ করলে!' স্ত্রী যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একদম লোপ পেয়ে গিয়েছিল?'

স্ত্রীর কান্নাকাটি ও তিরস্কার ভর্ৎসনায় বেচারা গানীসার মন খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তারও বিশ্বাস অগাধ, তেমনি একজন মুসলমানের কথার প্রতিও। সে ভাবলো, আমি তো কোনো খারাপ কাজ করিনি। বরং একজন মুসলমানকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। কিন্তু তার মন মানলো না। সারারাত তার একটুও ঘুম হলো না। সারাটা বিছানায় যেন কাঁটা বিছানো আছে বলে মনে হলো। এপাশ ওপাশ করলেই ফুটে যাচ্ছে গায়ে। আবার সোজা হয়ে এক দণ্ড শোয়াও যায় না। বুকের মধ্যে যেন হু হু করে উঠছে।

গানীসার কেবলই মনে হতে লাগলো, কাল সকালেই তার সব শেষ। কয়েদী আর ফিরে আসবে না। কাজেই কাল সকালে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

কিন্তু একি! সকালে উঠে নামাযের পরে বধ্যভূমিতে গিয়ে দেখে কয়েদী সবার আগে হাজির।

'তুমি কেমন লোক হে! নিজের জানের পরোয়া নেই।'

'আল্লাহকে যে ব্যক্তি হাজির-নাজির জানে সে কখনো কথার বরখেলাপ করে না। সারা পৃথিবী ভেঙ্গে পড়লেও সে দাঁড়িয়ে থাকবে অটলভাবে। যা হোক গানীসার দেহে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হলো। সে কয়েদীকে নিয়ে হাজ্জাজের সামনে গেলো। সমস্ত ঘটনা তাকে শোনালো। হাজ্জাজ সব শুনে বললো:

'সাব্বাস ! এই তো বাপের বেটা। ওহে গানীসা, এর মৃত্যুদণ্ড রদ করে দিলাম এবং একে তোমার জিম্মায় দিলাম। তুমি এর সাথে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো।'

তখনই গানীসা তাকে মুক্ত করে দিলো। সে গানীসার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক কোনো কথা না বলে চলে গেলো।

গানীসা ভাবলো, ব্যাপার কি লোকটা পাগল-টাগল নয়তো। কিন্তু পরের দিন দেখা গেলো লোকটা ফিরে এসেছে গানীসার কাছে। সে বলছে ঃ

'গতকাল আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি। তাই আজ এসেছি। কাল তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে তার শরীক হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। কাল সারাদিন আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। যাকিছু হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে এবং তার সাহায্যেই হয়েছে। সত্যকে সমর্থন করে তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছো তাই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন।'

গানীসা তাকে এছাড়া আর কিছুই বলতে পারলো না, 'আমার ভাই, আল্লাহ করুণা করলে দুনিয়ার আর কিছুতেই আটকায় না।'

মা আমার মা
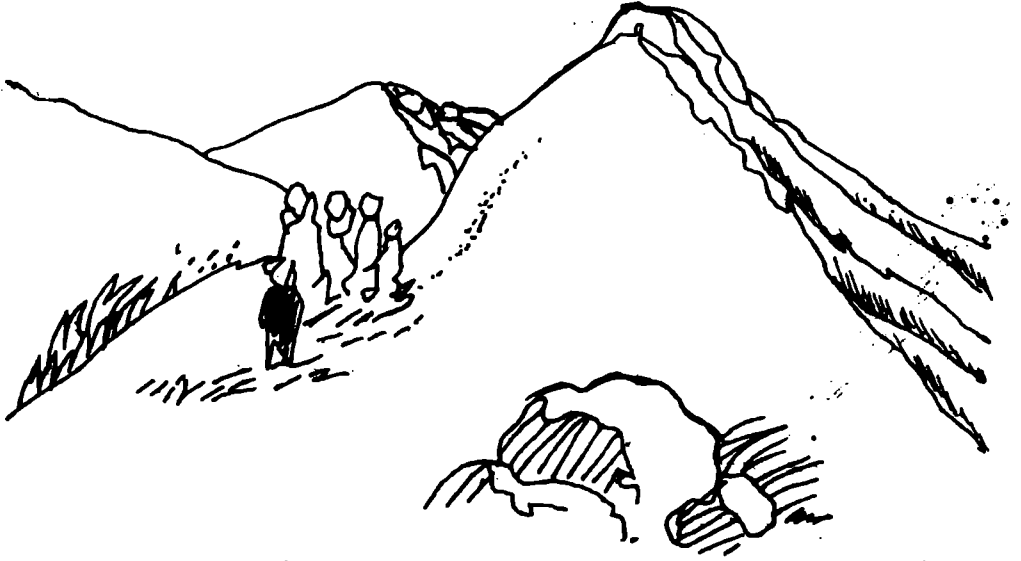
টিলার ওপর থেকে নামবার সময় দূরে উপত্যকার এক কিনারে আমার মাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। পড়শী আরো ক'জন বয়স্কা মহিলার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার মা। আমার মা যেন আরো অনেক বুড়িয়ে গেছেন। ঘর থেকে যখন বের হয়েছিলাম তখন আমি ছিলাম চৌদ্দ বছরের একটি কিশোর। আর আজ আমি বাইশ বছরের এক তাগড়া যুবক। অনেক দেশ অনেক শহর ঘুরে আজ আট বছর পরে আমি দেশে ফিরছি। যেখানেই গেছি, যে উস্তাদের বাড়িতে থেকেছি, যে ছাত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছি সব জায়গায় আমার মায়ের কথা সবসময় মনে পড়েছে। কুফা, বসরা, বাগদাদ, দামেশক, সিরিয়া, ইরাক যেখানেই থেকেছি কোথাও আমার মাকে ভুলতে পারিনি। ভুলবোই বা কেমন করে? মা-ই যে আমার সব। আমার মায়েরও আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আব্বু সেই কবে আমার ছোট বেলায় আল্লাহর পিয়ারা হয়ে গেছেন। তারপর থেকে তো আমি আর মা, মা আর আমি।

আমার খোরাসানি ঘোড়াটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছিল। পেছনে আমার ছিল কয়েকটি মিসরী খচ্চর। সবার পিঠ দামী দামী বস্ত্র, শস্য এবং দিরহাম ও দীনারে ঠাসা।

এগুলো মোটেই আমার উপার্জন নয়। আমার একান্ত মোহতারাম উস্তাদ ইমাম মালেকের স্নেহের হাদীয়া তোহফা। নয়তো আমি একজন মুসাফির। চৌদ্দ বছর বয়সে মক্কায় আমার পড়াশুনা শেষ করে ফেলেছিলাম। ওখানে আর কোনো উস্তাদের কাছে আর কিছু শেখার ছিল না। তখন আমার মায়ের অনুমতি নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলাম। হাদীসের ইলম হাসিল করার জন্য। প্রথমে মদীনায় এসে ইমাম মালেকের শাগরিদ হয়েছিলাম। তাঁর লেখা হাদীসের কিতাব 'মুয়াত্তা' তো ক'দিনের মধ্যেই মুখস্ত করে ফেলেছিলাম।

আমার মায়ের জন্য মন খুব খারাপ করছিল বলে এবার বাগদাদ থেকে ফেরার পথে আমার মোহতারাম উস্তাদ ইমাম মালেকের সাথে দেখা করার জন্যই মদীনায় গেলাম। পাঁচ বছর পরে দেখা। দূর থেকে উস্তাদ আমাকে চিনতে পারেননি। তাঁর শাগরিদদের বিরাট জমায়েতের মধ্যে বসে পড়েছিলাম। তখন চলছিল, 'জেনেশুনে কাউকে আহত করার পরে যত প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তার সমাধান অনুসন্ধান।' ইমাম সাহেব প্রশ্ন করছিলেন। শাগরিদরা জবাব দিয়ে চলছিল। প্রত্যেকের জবাব ভুল হচ্ছিল। আমি দূর থেকে জবাব পাঠাচ্ছিলাম। আমার প্রত্যেকটি জবাব সঠিক হচ্ছিল। এক, দুই, তিন, চার, -----------------

ইমাম সাহেব অবাক, কে এই নওজোয়ান ? নতুন মনে হচ্ছে। এদিকে এসো আমার কাছে। কাছে গেলাম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। তুমি কি মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী ? আস্তে করে বললাম, জি হাঁ, আমি শাফেয়ী।

জবাব শুনতেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। নিজে কুরসি থেকে নেমে এলেন। বললেন, এখন তো তুমিই উস্তাদ। আমার কুরসিতে বসো এবং তুমিই ছাত্রদের পড়াও। 'জেনেশুনে আহত করা' সম্পর্কে চারশ' প্রশ্ন পেশ করলাম। কারো জবাব ঠিক হলো না। প্রত্যেকটার সঠিক জবাব দিয়ে সবাইকে হতভম্ব করে দিলাম। হযরত ইমাম আদর করে আমার পিঠ চাপড়াতে লাগলেন এবং দোয়া করতে থাকলেন।

সবশেষে নামায। নামায শেষে হযরত ইমাম এবার আমাকে টেনে নিয়ে চললেন তাঁর বাড়ির দিকে। সামনে আলীশান মহল। আমি অবাক হচ্ছিলাম।

'হযরত, আপনার সেই পুরানো পড়ো বাড়িটা, সেটা কোথায় ?'

'সেই জমির ওপরই তো এ মহলটা তৈরি করলাম।'

আমি কি করবো। আমার কোনো দোষ নেই। মনে ভীষণ ব্যথা পেলাম। আমার দু' চোখ ভিজে গেলো। টপটপ করে পানি পড়তে লাগলো। হায় আল্লাহ ! আমার মহান উস্তাদের এ দশা !

আমার অবস্থা দেখে হযরত ইমামও কাঁদতে থাকলেন। কান্নাজড়িত স্বরে বললেন ঃ

'শাফেয়ী ! তুমি কাঁদছো কেন জানি। আহা, তুমি বুঝি মনে করছো আমি দুনিয়ার বিষয়-আশয় ও অর্থ-সম্পদের ভোগে মেতে উঠেছি। মনে করছো, আখেরাতকে আমি দুনিয়ার পায়ে কুরবানী করে দিয়েছি।'

'জি হাঁ, এ আশংকা আমার বুকে ভীষণ ব্যথা হয়ে বাজছে।'

'আহা শাফেয়ী ! তুমি শুধু আমার শাগরিদ নও, আমার একজন সাচ্চা বন্ধুও। তোমার মতো লোক যতদিন আমার বন্ধু আছে ততদিন দুনিয়া আমাকে ভোলাতে পারবে না।

'এ যাকিছু তুমি দেখছো এসব নিছক আল্লাহর মেহেরবানী। এর সাথে আমার প্রচেষ্টার এক কানাকড়িও যোগ নেই। এসব ইলম হাসিলকারীদের তোহফা। তাদের হৃদয় নিংড়ানো হাদীয়া। এসব খোরাসান, মিসর এবং দুনিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে অজস্র ধারায় এসেছে এবং আসছে। তুমি জানো, আমাদের মহান নেতা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীয়া ফেরত দিতেন না। আমিও তাঁর সুন্নাতের পায়রুবি করেছি। এগুলো ফেরত দেইনি।

'চলো, ভেতরে চলো। দেখো কত রকমের তোহফা। খোরাসানের সবচেয়ে উন্নতমানের কাপড় প্রায় তিনশ' জোড়া ঐ বাক্সগুলোর মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে। এখনো এ ধরনের তোহফা বরাবর আসছে। তুমি তো তোমার মায়ের কাছে যাবে মক্কায়। এ কাপড়ের বাক্সগুলো সব তোমার। আমি চাই এগুলো সব তুমি মক্কায় নিয়ে যাবে। আর ঐ যে সিন্দুকটা দেখছো ওর মধ্যে রয়েছে পাঁচ হাজার সোনার দীনার।প্রত্যেক বছর আমি ওর যাকাত আদায় করছি। ওর অর্ধেক তোমার।'

আমি দেখলাম এসব কথা বলার সময় হযরত ইমামের চোখ মুখ থেকে আনন্দ উপচে পড়ছিল। ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কাছে আমার মাথা নুয়ে এলো। আমি অনুভব করলাম, সত্যিই ইমাম মালেক বড়, অনেক বড়। হীন ও ঘৃণিত দুনিয়ার লালসা তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আমি পেরেশান হয়ে বললাম ঃ 'হযরত ! আপনার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই। আপনি আমার উস্তাদ। দীনের ধন-সম্পদে আমাকে ধনী করে দিয়েছেন আবার দুনিয়ার ধন-সম্পদেও ধনী করে দিচ্ছেন।'

রাতে যখন বিছানায় গেলাম তখন আমি ছিলাম মদীনার ধনীদের একজন। অথচ কিছুক্ষণ আগেও আমি ছিলাম নেহাতই একজন দরিদ্র জ্ঞানপিপাসু মুসাফির মাত্র।

সকালে নামাযের পরেই ইমাম সাহেব আমার জন্য কয়েকটা সুন্দর খোরাসানি ঘোড়া আনলেন। আর আনলেন মিসরের কয়েকটি সুদর্শন খচ্চর। খচ্চরগুলোর পিঠে বাক্স পেটরা সিন্দুক ভরা ছিল।

আমি বললাম ঃ "হযরত ! সবগুলো ঘোড়া আমাকে দিচ্ছেন। অন্তত একটা ঘোড়া নিজের চড়ার জন্য রাখুন।"

"শাফেয়ী ! তুমি একথা বলছো ? কিন্তু আল্লাহর কাছে যে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। আল্লাহর রসূল সে মাটির বুকে আরাম করছেন আমার সওয়ারীর খুরের আঘাতে সে মাটির বুক বিদীর্ণ হতে থাকবে এযে আমি সহ্য করতে পারি না। একথা বলে তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

আমার চোখও ভিজে উঠলো। ভাবলাম, সত্যিই দুনিয়া ইমাম মালেককে পরাস্ত করতে পারেনি।

আগেই আমার ফেরার খবর দিয়ে মক্কায় লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, পথ বুঝি শেষ হবে না। এদিকে সংগে ছিল মূল্যবান সহায়-সম্পদ। এ বোঝাগুলো আরো সময় বাড়িয়ে দিচ্ছিল। শুধু মায়ের কথা মনে পড়ছিল। আমর মা। আহা গত আট বছর দেখিনি মাকে। মা আমার মা কেমন আছেন ? মা কি আরো বেশি বুড়িয়ে গেছেন ? মা কি আমার জন্য এখনো সারারাত আল্লাহর দরবারে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেন ? তিনি কি এখনো কেঁদে কেঁদে

মোনাজাত করেন ঃ হে আল্লাহ ! আমার বাপমরা ছেলেটিকে তুমি তোমার নবীর জ্ঞানে পূর্ণ করে দাও। হে আল্লাহ্ আমার ছেলের হাতে জ্ঞানের এমন আলো দাও যে আলোয় কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পথ দেখে চলতে পারবে।

যতই ভাবছিলাম ততই আমার অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে মক্কার কিনারা দেখার সাথে সাথে আমার মাকেও দেখতে পেলাম। যতই কাছে যাচ্ছিলাম আশপাশের আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। দেখলাম আমার মা দু' বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে দেখলাম পাশে আমার খালা। খালা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দেখলাম চতুর্দিকে অসংখ্য মানুষের ভীড় যুবক, বৃদ্ধ, শিশু এবং মেয়েরা।

বেশ কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একবার আমার ঘোড়া ও খচ্চরগুলো এবং মূল্যবান সম্পদগুলোর দিকে তাকাই আবার একবার আমার বুড়ি মায়ের দিকে তাকাই। কিন্তু মা আমার নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো নড়াচড়া নেই। ব্যাপার কি। সবাই খুশি। সবার মুখে হাসি। কিন্তু মায়ের মুখ মলিন।

বেশ কিছু সময় কেটে গেলো। আমি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। মায়ের হাত ধরলাম। বললাম,

"মা চলো।"

"কোথায় যাবো খোকা ?"

"কেন, বাড়িতে।"

"মনে আছে খোকা, তোকে যখন বিদায় দিচ্ছিলাম তখন আমার কাছে কিছুই ছিল না। ছিল মাত্র দু'টি পুরানো চাদর। তোর পড়ার শখ দেখে পথের পাথেয় হিসেবে সেই চাদর দু'টো তোকে দিয়েছিলাম। তুই ছিলি আর তোর সাথে ছিল আমার এক বুক আশা যে, তুই রসূলের হাদীসের ধনে সম্পদশালী হয়ে দেশে ফিরে আসবি। খোকা ! আমি তো তোকে দুনিয়ার সম্পদ আনতে পাঠাইনি। এতো গর্ব ও অহঙ্কারের সম্পদ। এগুলো দিয়ে কি তুই একথা বুঝাতে চাস যে, তোর চাচাত ভাইদের চেয়ে তুই বড় এবং তারা তোর কাছে তুচ্ছ ? আমার মুখে রা ছিল না। শুধু

আমার মাকে দেখছিলাম। আল্লাহু আকবার ! দুনিয়ার সম্পদের প্রতি এ নিস্পৃহতা ! দীনের জ্ঞানের এ শ্রেষ্ঠত্ব ! আল্লাহর প্রতি এ ভরসা ! শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে পড়লো। আমার দু' চোখ দিয়ে গরম পানির ধারা বয়ে চললো। হায় আল্লাহ ! কোথায় আমার মা আর কোথায় আমি। আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো, আমি যাকিছু দীনের জ্ঞান লাভ করেছি তার পেছনে রয়েছে আমার মায়ের দোয়া এবং তাঁর মহান আকাংখা। আমি অনুভব করলাম, বছরের পর বছর ধরে জ্ঞান আহরণ করেছি কিন্তু আজকে এ বালুকাময় উপত্যকার বুকে আমার বুড়ি মা আমাকে যে জ্ঞান দান করলেন তার তুলনা নেই। শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আকুল হয়ে আমি মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম।

আমি খুব নরম সুরে বললাম, "আম্মাজান ! বলেন তাহলে এখন কি করবো ?"

"কি করবে আর খোকা। চারদিকে ঘোষণা করে দাও। গরীব, অভুক্ত, অনাহারী মানুষরা আসুক। টাকা-পয়সা, খাদ্য-শস্য, নিয়ে যাক। যার সওয়ারী দরকার ঘোড়া-খচ্চর নিয়ে যাক। উলংগ-অর্ধ উলংগরা আসুক কাপড় চোপড় পরে চলে যাক।"

আমি ঘোষণা করে দিলাম। বেশি সময় লাগল না। ভীড় জমে উঠলো। সমস্ত ধন-দৌলত মক্কার গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে গেলো। তখন আমার কাছে একটি মাত্র খচ্চর ও পঞ্চাশটি দীনার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এতক্ষণে আমরা মক্কার মধ্যে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ আমার হাত থেকে ছড়িটা পড়ে গেলো। মক্কার এক বাঁদী পিঠে মশক নিয়ে চলছিল। সে নুয়ে পড়ে ছড়িটা উঠিয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে আমার হাতে তুলে দিলো। আমি তাকে ইনাম দেবার জন্য পকেট থেকে পাঁচটি দিনার বের করলাম। আমার মা তা দেখে বললেন ঃ

"খোকা ! ব্যাস, এ পাঁচটি দীনারই তোমার কাছে অবশিষ্ট রয়ে গেছে ?"

"না, আম্মিজান ! আরো কয়েকটা আছে ?"

"তা ওগুলো আবার কার জন্য রেখে দিলে ?"

"অসময়ে কাজে লাগবে, আম্মাজান ! শস্যও তো সব দিয়ে দিয়েছি। হয়তো আজকেই দরকার হবে।"

"আরে খোকা ! আমি তো অবাক হচ্ছি। দশটা দীনারের ওপর এতো ভরসা। আর যিনি দীনার ও সবকিছু দেন তার ওপর ভরসা নেই। বের করো সবগুলো দীনার। সব ক'টা এ বাঁদীকে দিয়ে দাও।"

আমি সব ক'টা দীনার বাঁদীকে দিয়ে দিলাম। এখন আমার হাত একদম খালি। কিন্তু আমার মন ! আমার মন বিপুল সম্পদে ভরে উঠেছিল। এর আগে এতো সম্পদশালী কখনো আমি ছিলাম না।

আর আমার মা। আমার মা আল্লাহর কাছে শোকর গুজারী করছিলেন। আমার মা হেসে বললেন ঃ "খোকা ! এবার তুই ঠিক সেই অবস্থায় আমাদের ছোট্ট ঘরটিতে প্রবেশ করবি যে অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলি। কিন্তু আজ আমার ছোট্ট ঘরটি এমন আলোয় ভরে যাবে যে আলো সেখানে এর আগে ছিল না। আমার খোকা ! আল্লাহ তোর ভাগ্যে রেখেছেন জ্ঞানের আলো। আমি চাই না দুনিয়ার তুচ্ছ আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাসে এ আলো স্তিমিত হয়ে যাক এবং এর শিখা ঝিমিয়ে পড়ুক।"

"খোকা ! তোর মনে আছে, যেদিন তোকে বিদায় দেই সেদিন আমি আল্লাহর কাছে কি দোয়া করেছিলাম ? আমি দোয়া করেছিলাম, হে আল্লাহ ! আমার খোকাকে জ্ঞানের আকাশে সূর্য বানিয়ে দাও। খোকা ! আমি চাই না দুনিয়ার ধন-দৌলতের ময়লায় সেই সূর্যের আলো আবছা হয়ে যাক। দুনিয়াতেও আল্লাহ তোর জ্ঞানের আলোয় মানুষকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং আখেরাতেও এ আলো মু'মিনদের কাজে লাগবে।"
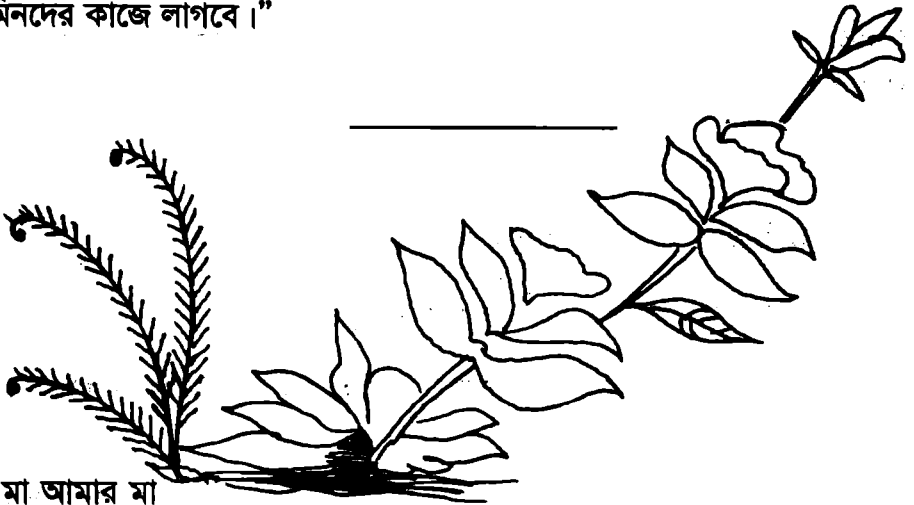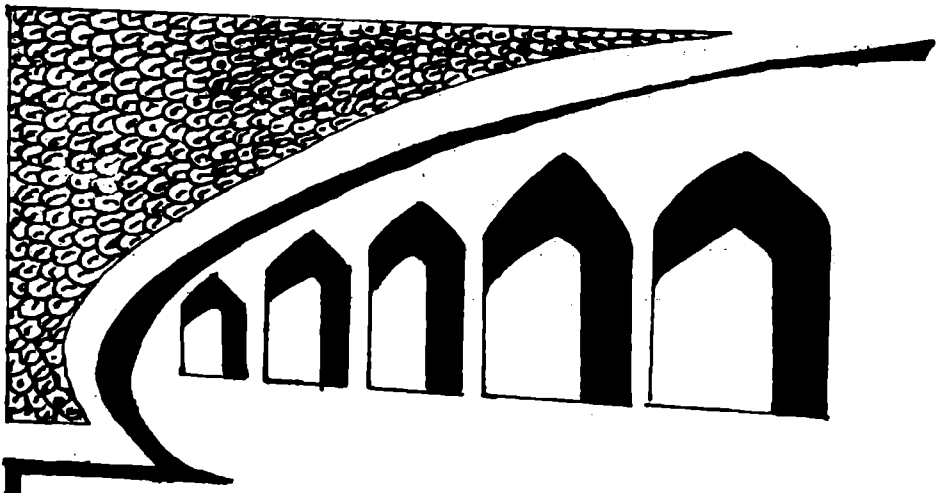
চৌকাঠ বদলাও

মেয়েটি একটু অবাকই হলো এই ভরদুপুরে অপরিচিত বৃদ্ধটিকে তাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে। সে আন্দাজ করতে লাগলো লোকটির বয়স কত হবে। একশ'রও বেশকিছু বেশী তো হবেই। কিন্তু এ বয়সেও বেশ শক্ত সমর্থ আছে। কেমন সোজা হয়ে হেঁটে চলে আসছেন ভদ্রলোক।

অপরিচিত লোকটিও একটু অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে এবং চারদিকে নজর বুলাতে বুলাতে আসছেন। চারদিকে বেশ বড়সড় একটা জনবসতি গড়ে উঠেছে। হ্যাঁ, জুরহুম গোত্রের কিছু লোকজন পানির সন্ধান পেয়ে মক্কার এ নিম্নভূমিতে এসে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু মাত্র এই ক' বছরে তা এতোবড় একটা জনবসতিতে পরিণত হবে একথা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে যখন তিনি আল্লাহর হুকুমে এখানে রেখে গিয়েছিলেন তখন তো এটা শুধুমাত্র একটা জনপ্রাণীশূন্য মরু ও পার্বত্য এলাকাই ছিল না, চারদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোথাও এক ফোঁটা পানিরও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কী অপার মহিমা ! আজ এখানে পানির কোনো অভাব নেই। অপরিচিত লোকটি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে আসছিলেন না জানি ইসমাঈল এখন কি অবস্থায় আছে। তার মায়ের মৃত্যুর খবর তো পেয়েছিলাম কিন্তু তারপর থেকে তার

আর কোনো খবর পাইনি। তার মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর ভরে যাচ্ছিল। কেমন ছিল তাঁর সবর ও আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস। আল্লাহর হুকুমে একমাত্র শিশু পুত্রকে আল্লাহর রাহে কুরবানী করে দেবার জন্য তাঁর সম্মতি চাইলে তিনি হাসিমুখে পুত্রকে পিতার হাতে তুলে দিলেন। আহা, কী তাঁর ত্যাগ ! আল্লাহর হুকুমের কাছে কীভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথা চিন্তা করলে আজো স্ত্রী গর্বে তাঁর মন ভরে ওঠে। ইসমাঈল সেই আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ মায়ের সন্তান।

একথা ভাবতে ভাবতে তিনি ইসমাঈলের বাড়ির সামনের উঠানে হাজির হয়ে গেলেন। একটি মেয়েকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সালাম দিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

মেয়েটি বললো, "আমি ইসমাঈলের স্ত্রী।"

"ইসমাঈল কি বাড়িতে আছে ?" আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন।

"না, তিনি এখানে নেই। রিযিকের সন্ধানে দূরে কোথাও গেছেন।" বললো মেয়েটি।

"তোমাদের দিন কিভাবে চলছে ?" আগন্তুক জানতে চাইলেন।

"আমরা বড় কষ্টে আছি। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে।" আগন্তুকের সামনে মেয়েটি নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা করলো না।

আগন্তুক বললেন, তোমার স্বামী ঘরে ফিরে এলে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাকে নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলতে বলবে।"

আগন্তুক আর কোনো কথা না বলে নিজের কোনো পরিচয় না দিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে ইসমাঈল বাড়ি ফিরলেন অনেক পরে। বাড়ি ফিরে তিনি যেন অনুভব করলেন বাড়িতে কোনো নতুন লোক এসেছিল। স্ত্রীকেও আগের মতো স্বাভাবিক দেখলেন না। তাকে যেন সবসময় কি ভাবছে কি ভাবছে বলে মনে হলো।

তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আমাদের বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক এসেছিলেন কি ?"

স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, আমি সে কথাই তো ভাবছি এতক্ষণ। আপনাকে বলবো বলবো করে বলে উঠতে পারিনি।"

কি ব্যাপার ? কে এসেছিলেন ? কেমন দেখতে তিনি।" ইসমাঈল এক সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করে বসলেন।

স্বামীর প্রশ্নের জবাবে স্ত্রী আগন্তুকের নাম বলতে পারলো না। তবে তাঁর চেহারা-সুরাতের একটা বর্ণনা দিয়ে দিলো এবং বয়সটাও বললো অনুমান করে।

ইসমাঈল বললেন, তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?"

স্ত্রী বললে, "হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে আপনার খবর জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনি রিযিকের সন্ধানে বাইরে গেছেন।"

"তিনি কি আরো কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?"

"তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের দিন কেমন কাটছে ? আমি জবাবে বলেছিলাম, আমরা বড় কষ্টে আছি, অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে।

ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কি তোমাকে কোনো আদেশ দিয়ে গেছেন?" স্ত্রী বললো, "হ্যাঁ, তিনি আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম জানাই এবং আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলতে বলি।"

ইসমাঈল বললেন, "তিনি হচ্ছেন আমার পিতা ইবরাহীম। আর তুমি হচ্ছো আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। তিনি তোমাকে তালাক দেবার জন্য আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন। কাজেই তুমি তোমার আত্মীয়-পরিজনদের কাছে ফিরে যাও।

ইসমাঈলের মনে পড়লো তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কথা। তখন এই জনমানবহীন নিম্নভূমিতে তিনি ও তাঁর মা ছাড়া আর কোনো প্রাণীর চিহ্ন ছিল না। তারপর একদিন জুরহুম গোত্রের লোকেরা পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর কটেছে। তারা ছিল আরবী ভাষী। তাদের কাছেই তিনি ও তাঁর মা আরবী ভাষা শেখেন। তাঁর উন্নত আচার-আচরণ দেখে জুরহুম গোত্রের লোকেরা তাঁকে খুব ভালোবাসতো। তারাই

তাঁর মায়ের কাছে প্রস্তাব এনে নিজেদের গোত্রের মেয়েটির সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর পিতা এসে জানিয়ে দিয়ে গেছেন, এ মেয়েটি তাঁর পুত্রের স্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখে না। তাই পিতার নির্দেশে তিনি এ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জুরহুম গোত্রের আর একটি মেয়েকে পসন্দ করে বিয়ে করলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ) অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরে যেতে থাকলেন। বাড়িতে থাকতো শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী। একদিন তাঁর স্ত্রী দেখলেন একজন অপরিচিত বৃদ্ধ তাদের বাড়ির দিকে আসছেন। বৃদ্ধের সালামের জবাব দেবার পর ইসমাঈলের স্ত্রী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্বামী কোথায় গেছে?"

"তিনি রিযিকের তালাশে বাইরে গেছেন।" ইসমাঈলের স্ত্রী জবাব দিলেন।

বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের দিন কেমন কাটছে?"

"আল্লাহ আমাদের খুব সুখে রেখেছেন।" ইসমাঈলের স্ত্রী জবাব দিলেন এবং তারপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

একথা শুনে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি খাও?"

"আমরা গোশত খাই।"

"তোমরা কী পানীয় পান করো?"

"আমরা পানি পান করি।"

বৃদ্ধ বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাদের জন্য তাদের গোশ্‌ত ও পানীয়তে বরকত নাযিল করো।"

সে যুগে আরবে গম, যব, ভুট্টা বা ধানের মতো কোনো শস্য পাওয়া যেতো না। এসব পাওয়া গেলেও ইসমাঈলের সংসারে এগুলোরও প্রচলন থাকতো।

এ অবস্থায় সম্মানিত বৃদ্ধ মেহমান এ শস্যগুলোতেও বরকত দেবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। তাঁর এ দোয়ার বরকতেই মক্কার লোকেরা শুধুমাত্র গোশ্‌ত ও পানি খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে।

বৃদ্ধ মেহমান এরপর ইসমাঈলের স্ত্রীকে বললেন, "তোমার স্বামী বাড়িতে ফিরে এলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবে এবং তাকে বলবে, তার ঘরের দরজার চৌকাঠ যেন না বদলায়।"

ইসমাঈল ফিরে এসে একটু ভিন্ন অবস্থা অনুভব করতে পেরে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের বাড়িতে কি কোনো অপরিচিত মেহমান এসেছিল?"

স্ত্রী জবাব দিলো, "হ্যাঁ, একজন বেশ সুগঠিত চেহারার অপরিচিত বৃদ্ধ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।" একথা বলে স্ত্রী বৃদ্ধের চেহারার বর্ণনা দিতে থাকলো।

ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, "বৃদ্ধ মেহমান কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে আপনার খবর জানতে চেয়েছিলেন এবং আরো জানতে চেয়েছিলেন আমাদের সংসার কেমন চলছে। আমি তাঁকে বলেছি, আপনি রিযিকের তালাশে বাইরে গেছেন এবং আমাদের দিন ভালোই চলছে। আমরা গোশ্‌ত খাই ও পানি পান করি। আল্লাহ আমাদের সুখে রেখেছেন।" স্ত্রী এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে ফেললো।

ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, "বৃদ্ধ মেহমান কি তোমাকে কোনো আদেশ করে গেছেন?"

স্ত্রী বললো, "হ্যাঁ, তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম জানাতে বলে গেছেন এবং আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ না বদলাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।"

ইসমাঈল বললেন, "এ বৃদ্ধ মেহমান হচ্ছেন আমার পিতা। তিনি যে চৌকাঠটি না বদলাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন সেটি হচ্ছো তুমি। তিনি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে রাখার অনুমতি দিয়ে গেছেন।"

মাছের পেটে মানুষ
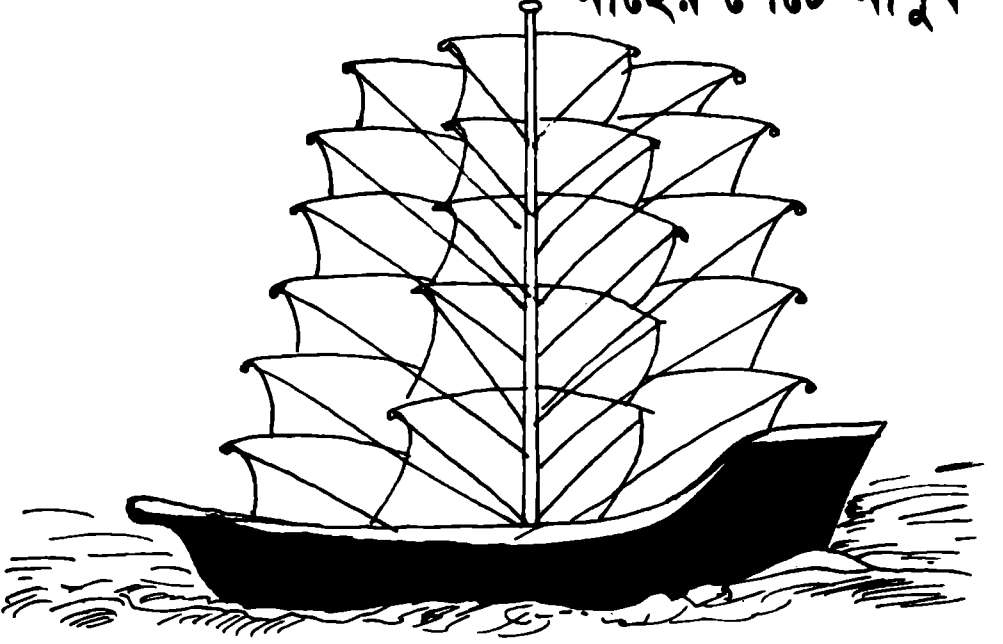
নৌকা তো আগে থেকেই বুক সমান ভরা ছিল। আরোহীদের পা ছড়িয়ে বসার ঠাঁই ছিল না। তার ওপর মাঝপথে দেখা দিলো তুফান।

স্রোতবাহী দাজ্‌লা এমনিতেই ক্ষুব্ধ। এবার তুফান তাকে করে তুললো মারমুখো। নৌকার টালমাটাল অবস্থা। একবার এদিকে কাত হয় একবার ওদিকে। যাত্রীরা ভয়ে চিৎকার দিতে থাকলো। এখন সবার মুখে আল্লাহর নাম।

'হে আল্লাহ্, বাঁচাও! বাঁচাও !'

মানুষের কাতর প্রার্থনা, বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ উত্তাল তরঙ্গের গর্জনের সাথে মিশে যেন মরণের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

মাঝিরা বলতে থাকলো, আর বুঝি বাঁচানো গেলো না। এবার ডুবতে হবে। কোনো কৌশল কাজে লাগছে না। গায়ের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে আসছে।

"তবে কি আমাদের মধ্যে কোনো পলাতক গোলাম আছে?' একজন বললো।

'হ্যাঁ, তাইতো, মনিবের অনুমতি না নিয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, এমন কোনো গোলাম কি এ নৌকায় আছে ?" অন্য একজন বললো।

'এ ধরনের পলাতক আসামীকে নদীতে না ফেলে দেয়া পর্যন্ত এ নৌকা থির হবে না', একজন মাঝি জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমরা বাপ-দাদার আমল থেকে এমনটিই দেখে আসছি।'

কিন্তু কারোর মুখে রা'টি নেই। কে এই ধরনের পলাতক আসামী ?

এতক্ষণে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের খেয়াল হলো।

তাহলে আমিই কি সেই পলাতক আসামী ? মনে মনে ভাবলেন তিনি। আমিই তো আমার প্রভু ও মনিব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম ও অনুমতি ছাড়াই নিনেভা ছেড়ে পালাচ্ছি। আমার জাতিকে তো আমি বলে এসেছি, তোমরা যখন আল্লাহকে প্রভু বলে মেনে নিতে রাজি নও, তাঁর ইবাদত না করে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করছো, আমাকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিচ্ছো না তখন তোমাদের ওপর আল্লাহর গযব নামবে। আর মাত্র তিন দিন। তিন দিনের মধ্যে যদি তোমরা সোজা না হও, আল্লাহর হুকুম মেনে না নাও, তাহলে তিন দিন পরে নামবে আল্লাহর গযব।

তিন দিন তো আজ শেষ হয়েছে। এখন রাত শুরু হয়েছে। তাইতো আমি পালাচ্ছি। আল্লাহর গযবের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছি।

কিন্তু আমি কি আল্লাহর হুকুমে পালাচ্ছি ? আল্লাহ কি আমাকে পালাবার হুকুম দিয়েছেন ? কৈ তিনি তো আমাকে এখান থেকে হিজরত করতে বলেননি ? তাহলে কি আমি ভুল করছি না ? আমি তো আমার প্রভু-মনিব আল্লাহর গোলাম। আমি তো মনিবের হুকুম ছাড়াই পালাচ্ছি। এসব ভাবনা-চিন্তা করতে করতে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ 'আমিই সেই পলাতক গোলাম। আমার মনিবের অনুমতি ছাড়াই আমি পালাচ্ছি। আমাকে নৌকা থেকে ফেলে দাও। তোমাদের নৌকা বেঁচে যাবে।'

'না, না', মাঝিরা প্রতিবাদ করলো, 'আমরা জানি আপনি ভালো লোক। আমরা শুনেছি আপনি নিনেভায় মানুষকে ভালো ও সৎ হবার শিক্ষা দেন। আপনি অপরাধী হতে পারেন না। এখানে নিশ্চয়ই অন্য কেউ অপরাধী হয়ে ঘাপটি মেরে আছে।'

'ঠিক আছে, এসো তাহলে আমরা লটারী করি' একজন বললো।

'না, আমিই অপরাধী' হযরত ইউনুস আবার জোর দিয়ে বললেন।

'না, না, এ হতে পারে না। আমরা লটারী করবো আপনার মতো সৎ লোককে আমরা দরিয়ায় ফেলে দিতে পারি না।' মাঝিরা একযোগে চীৎকার করে উঠলো।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো লটারীতে হযরত ইউনুসের নাম উঠেছে। একবার, দুবার, তিনবার। বাহ্ প্রত্যেক বারেই হযরত ইউনুসের নাম !

হযরত ইউনুস বললেন, 'আমি আমার মালিকের অনুমতি ছাড়াই নিনেভা শহরের এক লাখ বিশ হাজার মানুষকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। আমি তাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছি। আমি এমন একজন গোলাম যে তার মনিবের কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। কাজেই আমিই অপরাধী। তোমরা আমাকে দরিয়ায় ফেলে দাও।'

সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। এদিকে নৌকা বরাবর উথাল পাথাল হচ্ছিল। তুফানের প্রচণ্ড ধাক্কায় এই ডোবে এই ডোবে অবস্থা। মাঝিরা আর সামাল দিতে পারছিল না। একজনের জন্য সবাই ডুবে মরতে তারা চাচ্ছিল না। শেষে তারা ফায়সালা করলো লটারীতে যার নাম উঠেছে তাকেই পানিতে ফেলে দিতে হবে।

হযরত ইউনুসকে পানিতে ফেলে দেয়া হলো। অমনি একটি বিরাট মাছ তাঁকে গিলে ফেললো। মাছটি যেন প্রথম থেকে তৈরি হয়েই ছিল। সে তার মুখের বিরাট হা-এর মধ্যে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পেটের ভেতর চালান দিলো। তাঁকে চিবানো বা হজম করা ছিল তার সাধ্যের বাইরে। তাই তাঁকে পেটের মধ্যে নিয়ে ঘুরতে থাকলো এদিক থেকে ওদিক।

হযরত ইউনুস নিজেকে দেখলেন একটি গভীর আঁধারের বুকে। একে তো অন্ধকার রাত। দরিয়ার অথৈ কালো পানির বুকের আঁধার। তার ওপর মাছের পেটের আঁধার। আঁধারের বুকে যেন ডুব দিলেন আল্লাহর নবী। এত আঁধার তবুও তাঁর মনে কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখ হলো তাঁর আল্লাহর নারাজির। তাই এই নিকষ কালো আঁধারের মধ্যে আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহকে ডাকলেন, হে আমার মালিক ! তুমি ছাড়া আমার আর কোনো মাবুদ নেই। তুমি ছাড়া বিপদে যার কাছে সাহায্য চাইতে পারি এমন কোনো প্রভু আমার নেই। হে আমার মালিক। তোমার সত্তা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত। অবশ্যই

আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করে আমি নিজের জাতির লোকদের ছেড়ে চলে এসেছি। হে আমার মা'বুদ। আমি তোমার হুকুম অমান্য করেছি। এজন্য আমি লজ্জিত। তুমি আমার প্রতি রহম করো। আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।"

আল্লাহ্ হযরত ইউনুসের ডাক শুনলেন। তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

মাছটি তাঁকে পেটের মধ্যে নিয়ে চল্লিশ দিন দরিয়ার বুকে সাঁতার কাটতে থাকলো। আল্লাহর নবীকে গিলে ফেলার হুকুম তাকে দেয়া হয়েছিল, হজম করার হুকুম দেয়া হয়নি। তাকে বলা হয়েছিল ইউনুস তোমার খাদ্য নয়, তার শরীরের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।

আল্লাহর হুকুমে মাছটি তাঁকে দরিয়ার কিনারে একটি বিরান জায়গায় উগ্‌রে দিলো। চল্লিশ দিন মাছের পেটে থাকার কারণে পাখির তুলতুলে বাচ্চার মতো তাঁর শরীরটি হয়ে গিয়েছিল একেবারে নরোম। তাঁর গায়ে একটি পশমও ছিলো না। তাঁকে বেঁচে থাকার ও সুস্থ্ হয়ে ওঠার জন্য আল্লাহ্ একটি ব্যবস্থা করে দিলেন। লাউ বা এ ধরনের কোনো লতানো গাছ সেখানে উৎপন্ন হলো। এর ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এবং এর ফল খেয়ে তিনি কিছু দিনের মধ্যে সুস্থ্ হয়ে উঠলেন। একদিন এই গাছের গোড়ায় পোকা লাগলো। পোকারা গাছের সব শিকড় কেটে দিলো। ফলে গাছটি শুকিয়ে মরে গেলো। গাছটির এ অবস্থা দেখে হযরত ইউনুস খুব দুঃখ করতে লাগলেন।

আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, হে ইউনুস ! তুমি একটি লতানো গাছ মরে গেছে বলে কত দুঃখ করছো। আর আমার এক লাখেরও বেশী বান্দা ধ্বংস হয়ে যাবে এতে আমার কোনো দুঃখ হবে না ? তাদের জন্য আমার কি দয়া ও স্নেহ মায়া-মমতা নেই? আর শুধু মানুষই নয়, সেখানে তো রয়েছে অনেক গৃহপালিত জানোয়ার, গাছপালা, পোকামাকড় এবং আরো কত শত রকমের জীব। এদের সবার প্রতি কি আমার মায়া-মমতা নেই ?

হে ইউনুস! তুমি তো আমার হুকুমের অপেক্ষা না করে গোমরাহ জাতির ধ্বংসের জন্য বদ দোয়া করে চলে এলে। তুমি কি জানো এরপর সেখানে কি ঘটেছে ? আমার আযাব নাযিল করার আগে আযাবের সামান্য চিহ্ন ফুটে উঠতেই রাতারাতি

সমস্ত জাতিই মনে-প্রাণে তওবা করেছে। তারা আর আমার অবাধ্য নয়। তারা এখন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার হাতে তারা ঈমান আনতে চায়।

যাও, তুমি আবার নিনেভায় চলে যাও। তোমার নিজের জাতির মধ্যে বসবাস করো। তাদের সঠিক পথ দেখাও। তাদেরকে আমার অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলো।"

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আবার নিজের জাতির মধ্যে ফিরে এলেন। লোকেরা তাঁকে দেখে দারুন খুশী হলো। তাঁর নেতৃত্বে তারা এগিয়ে চললো দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের পথে।

এটি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম অষ্টম শতকের একটি ঘটনা।
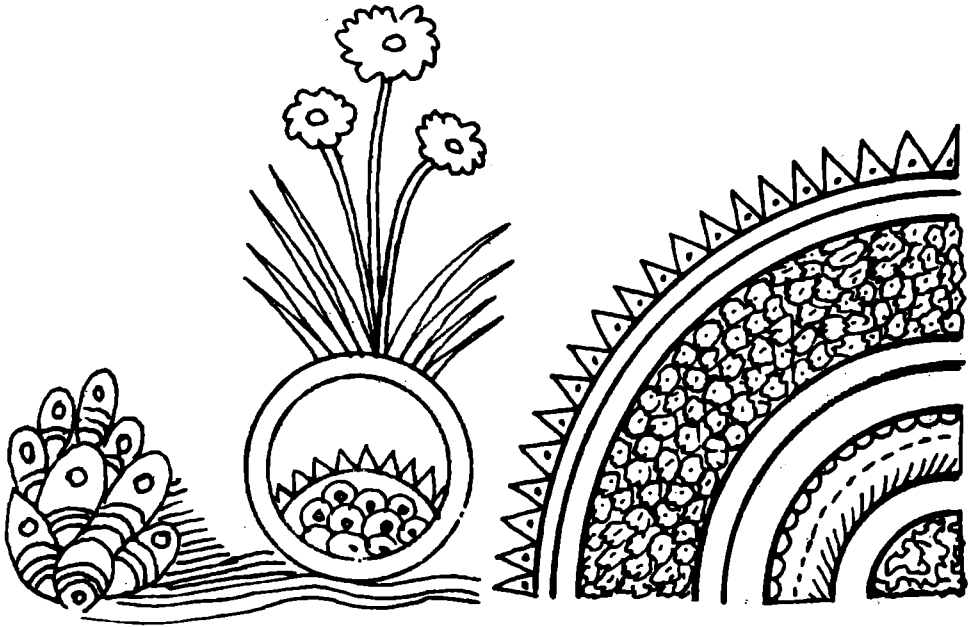
অসামান্য আলোক শিশু

“দেখো, দেখো, কী সৌভাগ্য আমাদের ! এক অসামান্য আলোক শিশু কূয়ার ভেতর।”

পানি বহনকারী গোলামটির চীৎকারে কাফেলার অনেকেই দৌড়ে এসে কূয়াটির চারপাশে জটলা পাকালো। সবাই মিলে বালতির দড়ি ধরে ঝুলে থাকা কিশোরটিকে টেনে কূয়ার বাইরে আনলো। সত্যি চারদিক যেন আলোয় ঝলমল করে উঠলো। মানুষের রূপ এমন হতে পারে ! মানুষ নয় যেন আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে।

ষোল সতের বছরের কিশোরটি মুখ ফুটে কিছুই বলছে না। আর বলবেই বা কি? তার ভাইয়েরা তার সাথে যে ব্যবহারটি করে গেলো, কোনো শত্রুও বুঝি এমনটি করে না। তাইতো সে একেবারে চুপসে গেছে। তার মায়ের পেটের তারা দুই ভাই। তাদের মা মারা গেছেন। তাই তাদের পিতা তাদেরকে একটু বেশী ভালোবাসেন। বিশেষ করে তাকে সব ভাইয়ের চাইতে বেশী ভালোবাসেন। সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখতেন। তাই দেখে বিমাতার সন্তান অন্য দশ ভাইয়ের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো।

"আব্বাজান ইউসুফের মধ্যে এমন কী দেখেছেন, তাকে অত বেশী ভালোবাসেন ? সবসময় তাকে সাথে সাথে রাখেন ?"

"কী জানি ওই অথর্ব ছেলেটার মধ্যে কী পেয়েছেন তিনি ! হাঁ দেখতে একটু বেশী সুন্দর আর বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে না হয় একটু বেশী। কিন্তু তা বলে আমরা দশ ভাই দশটি তাগড়া জোয়ান, আব্বাজানের সব কাজে কামে আমরাই তো সাহায্য করি। ওই অপদার্থ সুন্দর ছেলেটা তাঁর কোন্ কাজে লাগবে ?"

"তাইতো, মেজ ভাই ঠিকই বলেছেন। আমাদের ভেড়ার পালের ওপর যখন একদল নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমরা দশ ভাই এক মিনিটের মধ্যে লাঠিপেটা করে তাদেরকে সাবাড় করে দিই।"

"আর দিনের বেলা হোক বা রাতের আঁধারে আমাদের কোনো শত্রুগোত্র যদি আমাদের বাড়ি ঘরের ওপর চড়াও হয় তাহলে লড়াই করে শত্রুদের পরাস্ত করবো তো আমরা দশ ভাই। আদরের দুলাল ইউসুফ তো ভয়ে কাঁপতে থাকবে। অথচ দেখো আব্বাজানের কেমন একচোখা নীতি, তাকেই বেশী ভালোবাসেন।"

"নাহ্ আর সহ্য হচ্ছে না। ইউসুফকে এ দুনিয়ার বুক থেকে সরাতে হবে।"

"আমারও তাই মনে হয়। ইউসুফকে সরাতে না পারলে আমরা আব্বাজানের মন জয় করতে পারবো না।"

"আমারও তাই মত।"

"আমারও।"

দশ ভাই একমত হয়ে গেলো। ইউসুফকে পিতার কাছ থেকে সরাতে হবে। কিন্তু কিভাবে সরানো যাবে ?

হযরত ইয়াকুব তাঁর এই ছেলেটিকে খুব বেশী ভালোবাসেন। তাকে সবসময় নিজের কাছে রাখেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে আলাদা করেন না। এই ছেলেটির মধ্যে তিনি পয়গম্বরীর সমস্ত লক্ষণ দেখেছেন। তাছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে তিনি যা ইংগিত পেয়েছেন তাতে তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর পরে আল্লাহ তাঁর এ ছেলেকেই নবুওয়াত দান করবেন। ইউসুফ হবে দুনিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ নবী। বিশেষ করে ইউসুফের সেই স্বপ্নটির কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। এগারটি তারকা এবং চাঁদ ও সুরুজ ইউসুফকে সিজদা করছে। অর্থাৎ কিনা ইউসুফের এগারটি ভাই এবং তার পিতা ও মাতা সবাই ইউসুফের সামনে নত হচ্ছে। এ স্বপ্ন তো ইউসুফের একজন শ্রেষ্ঠ নবী হবার ইংগিত দেয়।

এসব কথা ভেবে বৃদ্ধ ইয়াকুব ইউসুফের জীবন রক্ষার জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছেন। ইউসুফকে তিনি বারবার মানা করে দিয়েছেন তার এ স্বপ্নের কথা যেন ঘূনাক্ষরেও কাউকে না বলে। বিশেষ করে তার ভাইয়েরা একথা জানতে পারলে তো হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরবে। ফলে যে কোনো সময় তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে।

কিন্তু ভাইয়েরা তো তাদের পথের কাঁটা ইউসুফকে সরিয়ে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা আবার শলাপরামর্শ করলো। দশ মাথা এক হলো। দশ চালাকি একটি ভয়ংকর রূপ নিল।

"ইউসুফকে আমরা হত্যা করবো। এছাড়া কোনো উপায় দেখছি না। অথবা তাকে এমন কোনো জায়গায় ফেলে দিয়ে আসবো যেখানে সে নিজে নিজেই সাবাড় হয়ে যাবে। তারপর আমরা ভালো লোক হয়ে যাব। আর কোনো খারাপ কাজে আমরা হাত দেবো না। ফলে আব্বাজানের ভালোবাসা আমরা পাবো।" বললো এক ভাই।

"না না, তাকে মেরে ফেলো না," বড় ভাই বললো, বরং তাকে কোনো কূয়ার মধ্যে ফেলে দাও। যাওয়ার পথে হয়তো কোনো কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যেতে

পারে। আমাদের থেকে দূরে গিয়ে সে প্রাণে বেঁচে থাক। তাতে আমাদের তো কোনো ক্ষতি নেই। তার অবর্তমানে আব্বাজান আমাদের ঠিকই ভালোবাসেন।"

দশ ভাই মিলে বাপের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করলো ঃ

"আব্বাজান ! আমরা প্রতিদিন বনে খেলা করতে যাই। কত রকম ফলমূল পেড়ে খাই। কত আনন্দ করি। কিন্তু আমাদের ভাই ইউসুফ। সে ঘরে বসে থাকে আমাদের সাথে খেলতে যায় না। বনের তাজা ফলমূল খায় না। ফলে সে যেন সবসময় কেমন মনমরা হয়ে থাকে। তাকে আমাদের সাথে বনে খেলাধূলা করতে পাঠান।"

"হাঁ আব্বাজান ! দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যেই তার মন কেমন চাংগা হয়ে উঠেছে।"

"তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে আমি কেমন জানি ভরসা পাচ্ছি না। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে হযরত ইয়াকুব বললেন, তোমরা হয়তো খেলায় মত্ত হয়ে থাকবে, তার কথা ভুলে যাবে এবং এই সুযোগে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে। আমি এ ভয়টাই করছি।"

"আব্বাজান যদি নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে আমাদের এই দশ ভাইয়ের শক্তির মূল্যটাই বা কি থাকলো ! তাহলে তো আমরা নিরেট অপদার্থই প্রমাণিত হবো।" মেজ ভাই জোর দিয়ে বললো।

শেষ পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব রাজি হয়ে গেলেন। তারা ইউসুফকে সংগে নিয়ে বনে খেলা করতে গিয়ে তাঁকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলো। তারপর একটি পশু হত্যা করে ইউসুফের জামা-কাপড় তার রক্তে রাঙিয়ে নিল। পিতার সামনে এসে কাঁদতে কাঁদতে ইউসুফের রক্ত রাঙা জামা কাপড় রেখে দিয়ে বললো ঃ আমরা খেলা করছিলাম আর ইউসুফ আমাদের জামা-কাপড় পাহারা দিচ্ছিলো। আমাদের অজান্তে একটা নেকড়ে এসে ইউসুফকে ধরে খেয়ে ফেলেছে।

ওদিকে ইউসুফ মনে করছিল, সে যদি কাফেলার বণিকদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে দেয় তাহলে হয়তো বণিকরা তাকে ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু ভাইদের হাত থেকে আর সে বাঁচতে পারবে না। এবার ভাইরা তাকে প্রাণে মারেনি, কূয়ার মধ্যে

ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আগামীবারে একেবারে জানে মেরে দেবে। কাজেই নিজেকে বণিকদের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো মনে করলো। বণিকরা যেখানে চায় তাকে নিয়ে যাক। আল্লাহ তার ভালোই করবেন।

ঘটনাক্রমে বণিকদের এ কাফেলাটি যাচ্ছিল মিসরের পথে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের মিসর। রাজধানী মম্‌ফিস তখন পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য নগরী। এ নগরীর বাজারে ইউসুফের দাম খুব বেশী উঠলো না। বাদশাহ আপোফিসের রক্ষী বাহিনী প্রধান আযীয পোটিকর নিজেই এ গোলামটি কেনার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। আযিযের আগ্রহ দেখে কেউ আর তার দাম চড়াতে এগিয়ে যায়নি। ফলে খুব সস্তা দামে কিনে আযীয তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তার স্ত্রীকে বললেন ঃ

"দেখো, ছেলেটা খুব বড় ঘরের বলে মনে হচ্ছে। একে আমাদের বাড়িতে ভালোভাবে মর্যাদার সাথে থাকার ব্যবস্থা করো। আমাদের তো ছেলেমেয়ে নেই, চাইলে আমরা একে নিজেদের ছেলে হিসাবে গড়ে তুলতে পারি।"

জুলায়খা স্বামীর ইচ্ছায় বাধ সাধতে চাইলো না। আঠার বছরের তরুণটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলো সে। এতদিন তার নিজের এত রূপের গর্ব যেন মিথ্যা হয়ে গেলো। এ তরুণটিকে সে নিজের করে পেতে চায় কিন্তু নেকী, সততা ও পবিত্রতার প্রতীক ইউসুফের মনে সে একটুও দাগ কাটতে পারলো না।

আযীয তার নিজের সমস্ত ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ ও জায়গীরের দেখাশুনার ভার ইউসুফের ওপর ছেড়ে দিলেন। তিনি শুধু নিজের সরকারী চাকুরীটির সাথে জড়িত থাকলেন। ইউসুফ পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিল। চতুরদিকে তার রূপের সাথে সাথে আমানতদারী ও সততার কথাও ছড়িয়ে পড়লো।

জুলায়খা ইউসুফের জন্য পাগল হয়ে পড়েছিল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না। একদিন ঘরের মধ্যে তাকে একাকী পেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। সে বললো ঃ

"ইউসুফ আমার কাছে এসো।"

"আমি আল্লাহকে ভয় করি। আপনি আমার সম্মানিতা মনিব পত্নী। এই পরবাসে একান্ত বিরূপ পরিবেশে আল্লাহ্ আমাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। আমি আল্লাহর নাশোকর ও নাফরমান বান্দা হতে চাই না।"

ইউসুফ দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু পেছনে জুলায়খা তার জামা টেনে ধরলো। ফলে পেছন থেকে জামা ছিঁড়ে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে ইউসুফ দরজা খুলে ফেলেছিল। সামনেই দেখলো তার মনিব দাঁড়িয়ে এবং সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলায়খার এক আত্মীয়।

স্বামীকে দেখে জুলায়খার চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেলো। সে অভিযোগ করলো ঃ

দেখো, এই ইউসুফকে তুমি এতবেশী বিশ্বাস করো কিন্তু সেতো তোমার স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়েছে। এই দেখনা আমাকে একা পেয়ে ------- তোমরা না এসে পড়লে আজ আমার কীযে হতো।"

"ডাহা মিথ্যা কথা," ইউসুফ বললো।

"ওর কোনো কথা শুনবে না। তোমার স্ত্রীকে যে অপমান করতে চায় তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে। কঠিনতম শাস্তিই তার প্রাপ্য।" জুলায়খা ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মতো ফনা তুলে বললো।

"বরং সেই আমাকে কিছুদিন থেকে ফুসলাবার চেষ্টা করছে এবং আজ ঘরে একা পেয়ে দরজা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়েছেন।" ইউসুফ দৃঢ়তার সাথে আবার তার বক্তব্য পেশ করলো।"

"ঠিক আছে, এরা দু'জন তো দু'জনকে দোষারোপ করছে," মাঝখান থেকে জুলায়খার আত্মীয়টি বলে উঠলো, "এবং এখানে তৃতীয় কোনো সাক্ষীও নেই, এ ক্ষেত্রে আমরা ঘটনার সাক্ষী নিতে পারি।"

"কিভাবে ?" আত্মীয় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা আসামী দু'জনের কাপড় পরীক্ষা করতে পারি। যদি ইউসুফের কাপড় সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে ইউসুফ অপরাধী এবং জুলায়খা নিজেকে বাঁচাবার জন্য ইউসুফের সাথে লড়েছে। আর যদি ইউসুফের কাপড়

পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে জুলায়খা অপরাধী। কারণ, বুঝা যাবে ইউসুফ নিজেকে বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যাচ্ছিল এবং জুলায়খা তাকে পেছন থেকে কাপড় টেনে আটকাতে চেয়েছিল।"

তখনই ইউসুফের কাপড় পরীক্ষা করে দেখা গেলো তা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া।

আযীয নিজের স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু তাকে শাস্তি দিতে পারলেন না। সেকালের মিসরীয় সমাজে মেয়েরা এতবেশী অধিকার ভোগ করছিল যে, বড় বড় ঘরের মেয়েরা প্রায় হয়ে উঠছিল স্বৈরাচারী। তাই তিনি তাকে শুধু বলতে পারলেন, "তুমি অপরাধী, কাজেই তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

ইউসুফকে তিনি বললেন, "ইউসুফ! তুমি নিরপরাধ ও নিষ্পাপ। তোমার চরিত্র আলোর মতো পরিচ্ছন্ন। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকো।"
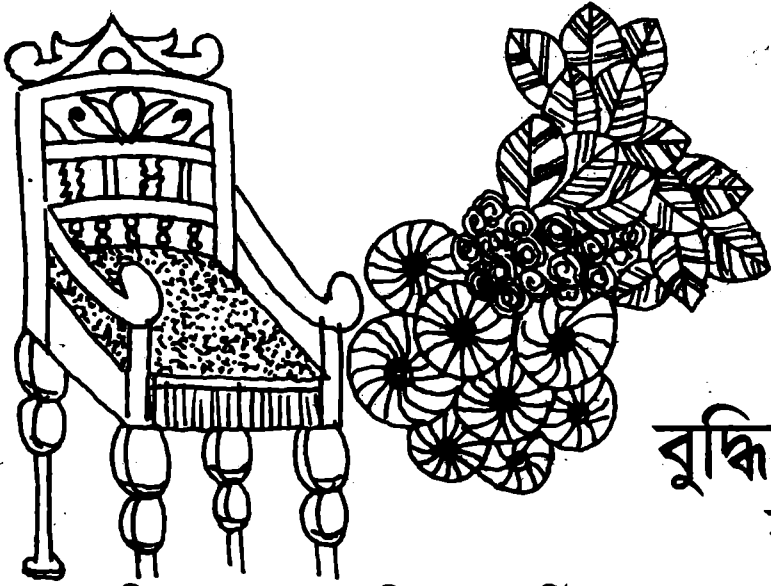
বুদ্ধিমতী রাণী

কি ব্যাপার, মন্ত্রীবর ! হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না যে। পাখিটা আজ গেলো কোথায় ?

জাঁহাপনা ! দরবারের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা সবাই যার যার জায়গায় মহামান্য বাদশাহর খেদমতে হাজির আছি। আমাদের সাথে হাজির আছে জিনদের প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য জীব-জানোয়ারদের প্রতিনিধিরাও। কেবলমাত্র হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না। জানি না সে কোথাও কোনো কাজে আটকা পড়ে গেছে কিনা।

সে আসুক। এই কর্তব্যে গাফিলতির জন্য তাকে আজ উচিত সাজা দেবো। বিলম্বের উপযুক্ত কারণ বলতে না পারলে এই গোস্তাখির জন্য তাকে প্রাণদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এসব কথাবার্তা চলছিল এমন সময় হুদ্‌হুদ্‌ কোথায় থেকে ফুরুত করে উড়ে এসে দরবারে তার আসনটিতে জেঁকে বসলো।

মাফ করবেন মহান আল্লাহর সম্মানিত নবী বাদশাহ সুলাইমান ! দরবারে পৌঁছুতে আমার আজ বিলম্ব হয়ে গেলো। কিন্তু এ বিলম্ব অহেতুক নয়। উড়ে উড়ে আল্লাহর বিশাল দুনিয়ায় তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির শোভা দেখে বেড়াচ্ছিলাম। পৌঁছে গিয়েছিলাম আরবের দক্ষিণ দিকে সাগর আর পাহাড় ঘেরা ইয়ামেন দেশে। সেখানে আছে সাবা নামে একটি রাজ্য। আশ্চর্য সে রাজ্য শাসন করছেন এক রাণী। তিনি বসেন এক

বিশাল সিংহাসনে। কিসের অভাব তাঁর ? সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের তাঁর অভাব নেই। বিপুল ক্ষমতার অধিকারিনী তিনি। আরো আশ্চর্য, সে দেশের মানুষ আল্লাহকে তাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক বলে স্বীকার করে না। তারা সূর্য দেবতার পূজা করে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করে এবং খোল-করতাল বাজিয়ে তার প্রশংসা কীর্তন করে। শয়তান নানা রকম কারুকাজ করে তাদের এসব কাজের বাইরের চেহারা খুব সুসজ্জিত করে দিয়েছে। ফলে তারা এতে মুগ্ধ ও বিমোহিত। কিন্তু আসলে তারা সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।

হুদ্‌হুদ্‌ ! তোমার সব কথা শুনলাম। তুমি নতুন খবর নিয়ে এসেছো ঠিকই, তবে তা কতটা সত্য শীঘ্রই প্রমাণ হয়ে যাবে। রাণীর নামে আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। এটি নিয়ে যাও। চিঠিটি তার সামনে ফেলে দাও। তারপর আড়াল থেকে দেখো তারা কি ভাবনা-চিন্তা করছে। আমার চিঠির তারা যে জবাব দেয় তা সরাসরি আমার কাছে নিয়ে এসো।

হুদ্‌হুদ্‌ উড়ে চললো আবার কয়েক দিনের পথ ফিলিস্তিন থেকে দক্ষিণে ইয়ামেনের সাবা রাজ্যের দিকে। উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর ইচ্ছা যেন আকাশকে ছুঁয়ে দেবে। কোথাও ধু ধু মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেদিকে দু' চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। যেন অথৈ বালির সাগর। সারারাত মুরু দুলালরা সারিবদ্ধ উটের কাফেলা নিয়ে মরু সাগর পাড়ি দিচ্ছে। উটের গলার ঘন্টা ধ্বনি এক নাগড়ে মর্তলোকে নুতন সংগীত রচনা করে চলছে। তার সাথে গলা মিলিয়ে কাফেলার তরুণ সাথীরা গেয়ে চলছে হুদিগান। মরুভূমির বুকে সৃষ্টি করেছে সে এক অপূর্ব জগত। আবার কোথাও লোহিত সাগরের নীল জলরাশির বুক চিরে উড়ে আসা শীতল বাতাস হুদ্‌হুদের সমস্ত হৃদয় মন জুড়িয়ে দিচ্ছে।

ক'দিন ক'রাত উড়ে চললো হুদ্‌হুদ্‌ এক নাগাড়ে। মাঝখানে খাবার ও বিশ্রাম নেবার জন্য কয়েকবার নেমে এসেছে সে উঁচু উঁচু গাছের ডালে। তারপর একদিন পৌছে গেলো। সাবার রাজ্যে।

সাবার রাণী বিলকিসের সাজানো গোছানো দরবার। মন্ত্রী, সভাসদ, আমাত্য, আমীর-উমরাহ্‌ সবাই যার যার জায়গায় বসে আছেন। রক্ষীরা নাংগা তরবারি ও বর্শা

হাতে পাহারা দিচ্ছে দরবারের ভেতরে বাইরে সর্বত্র। রাণীর হুকুম ছাড়া দরবারে একটি পিঁপড়ের ঢোকারও হুকুম নেই।

কিন্তু এমন সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে হুদ্‌হুদ্‌ রাণীর কোলে ফেলে দিল নবী বাদশাহ সুলাইমানের পত্রখানি। সে যুগে পাখির সাহায্যে এভাবে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করার রেওয়াজ ছিল। তাই রাণী বেশী অবাক হননি। তিনি যত্নের সাথে পত্রটি খুলে ফেললেন। মনোযোগ সহকারে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন পত্রের সবটুকু লেখা। দরবারীদেরকে বললেন, দেখো এখনি আমার কাছে এসেছে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ চিঠি। তাতে লেখা হয়েছে ঃ

"এ পত্রটি পাঠানো হয়েছে সুলাইমানের নিকট থেকে এবং পরম করুণাময় ও দয়াবান আল্লাহর নামে এটি শুরু করা হয়েছে। অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে হাজির হও।"

রাণী সভাসদদের বললেন, দেখো, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তোমাদের পরামর্শ ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না। এখন তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও আমি কি করবো। সভাসদরা বললো, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমরা শক্তিশালী, প্রয়োজন হলে আমরা যুদ্ধ করবো। তবে আপনি যা চাইবেন তাই হবে।

রাণী বললেন, আমরা শক্তিশালী এতে সন্দেহ নেই। আমাদের সাহসও আছে এবং যুদ্ধকৌশলও আমরা জানি। কিন্তু সুলাইমানের ব্যাপারে আমাদের সাবধানে পা ফেলতে হবে। কারণ, সুলাইমানের বাণী যেমন অদ্ভুতভাবে আমাদের কাছে এসেছে তাতে আমাদের সতর্ক হতেই হয়। তাই আমি বলি কি, আমরা কয়েকজন বুদ্ধিমান লোককে দূত হিসাবে সুলাইমানের কাছে পাঠাই। তারা বাদশাহর জন্য কিছু মূল্যবান উপহার নিয়ে যাবে। এ সুযোগে আমাদের দূতরা সুলাইমানের শক্তি সামর্থ কেমন এবং তিনি কি চান সেসব জানতে পারবে। যদি সত্যিই তিনি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সাথে লড়াই করার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, শক্তিশালী রাজা বাদশারা যখন কোনো দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা নগর ধ্বংস করে ফেলেন আর সম্মানিত লোকদের করেন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। কাজেই অযথা আমাদের ধ্বংসের দিকে পা বাড়িয়ে লাভ কি?

সাবার রাণীর দূত পৌঁছে গেলো হযরত সুলাইমানের দরবারে। তাদের মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেখে হযরত সুলাইমান মোটেই খুশী হলেন না। বরং তিনি একটু অসন্তুষ্টই হলেন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছো। তোমাদের রাণীর কাছে আমি যে বাণী পাঠিয়েছিলাম তার অর্থ এ নয় যে, উপহার দিয়ে তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করবে। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো, আল্লাহ আমাকে কম ধন-সম্পদ দেননি। তোমাদের মূল্যবান সামগ্রীর কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই। তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের রাণীকে গিয়ে বলো, তিনি যদি আমার হুকুম তামিল না করেন, তাহলে আমি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সেনাদল সাবা রাজ্য আক্রমণ করবে এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে নগর থেকে বের করে দেবে।

দূতরা দেশে ফিরে গেলো। রাণীকে জানালো হযরত সুলাইমানের সেনাবল, পরাক্রম ও শক্তিমত্তা যা যা তারা দেখেছিল ও শুনেছিল সবই খুঁটে খুঁটে বর্ণনা করলো। তারা জানালো, মানুষ তো মানুষ, জিন-পরী, পশু-পাখির ওপরও এই বাদশাহর রাজত্ব চলছে।

সাবার রাণী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন, সুলাইমান বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করবেন না। বরং তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করবেন। এজন্য তিনি হযরত সুলাইমানের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলেন। তিনি লোক-লশকর নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

আল্লাহর অহীর মাধ্যমে হযরত সুলাইমান একথা জানতে পারলেন। তিনি চাইলেন রাণীকে অবাক করে দিতে। এমন কিছু কাজ করতে যাতে রাণীর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যায়। তিনি হযরত সুলাইমানকে একজন সাধারণ বাদশাহ মনে না করেন। হযরত সুলাইমান যে আল্লাহর নবী একথা যেন রাণী বিশ্বাস করতে পারেন এবং এ বিশ্বাসের ফলে যেন তিনি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতে পারেন।

তিনি সভাসদদের বললেন, সাবার রাণী এখানে পৌঁছে যাওয়ার আগে আমি তার রাজ সিংহাসনটি এখানে উঠিয়ে নিয়ে আসতে চাই। তোমাদের মধ্যে কে তা আনতে পারবে?

এক বিশাল আকৃতির জিন বললো, আপনি আজকের এ দরবারের কাজ শেষ করার আগেই আমি সিংহাসনটি এখানে নিয়ে আসবো। এতে সিংহাসনের কোনো ক্ষতি হবে না। তার সাথে যাকিছু মূল্যবান সম্পদ জড়িত আছে সবই যার যার জায়গায় ঠিক থাকবে।

জিনের এ দাবী শুনে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখেন হযরত সুলাইমানের এমন একজন মন্ত্রী বলে উঠলেন, আপনি চোখের পাতা ফেলার আগেই আমি এ সিংহাসন এনে দিচ্ছি। বলতে না বলতেই হযরত সুলাইমান দেখলেন সিংহাসন তাঁর সামনে হাজির। তিনি বললেন, এ আমার পরম প্রভু রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। সাবার রাণীর সিংহাসনের কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন করার হুকুম দিলেন। রাণী সিংহাসনটি দেখে প্রকৃত সত্য বুঝতে পারেন কিনা তা তিনি দেখতে চাইলেন।

কিছুদিন পর। সাবার রাণী তাঁর লোকজন নিয়ে শান-শওকতের সাথে হযরত সুলাইমানের সামনে হাজির হলেন। তাঁকে দরবারে আনা হলো। হযরত সুলাইমান তাঁকে সিংহাসনটি দেখিয়ে বললেন, দেখুনতো আপনার সিংহাসন এ রকম কিনা? সাবার রাণী তো অবাক। এটা কেমন করে সম্ভব? বুদ্ধিমতী রাণী বললেন, এটা যেন আমার সিংহাসনই। কিন্তু এর কাঠামোর কিছুটা পরিবর্তনের কারণে আবার সন্দেহও হচ্ছে। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না এটা আমার সিংহাসন। তবে আপনার অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে আমি আগেও জানতে পেরেছি। তাই আপনার সামনে আমি একজন অনুগত হিসাবেই হাজির হয়েছি।

রাণী হযরত সুলাইমানের অসাধারণ শক্তি আন্দাজ করতে পারলেন ঠিকই কিন্তু এ শক্তি যে পুরোপুরি আল্লাহর দেয়া বুঝতে পারেননি। এখনো সূর্য দেবতার প্রতি তাঁর ভক্তি রয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে আরো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য হযরত সুলাইমান আর একটি পরীক্ষা চালালেন। তাঁর হুকুমে জিনেরা তখনই একটি আলীশান শীশ মহল তৈরি করে ফেললো। অতি স্বচ্ছ শুভ্র বর্ণের পাথরের ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র এলাকা রাতের বেলায়ও যেন দিনের মতো আলোকিত। উঁচু উঁচু প্রাসাদের চূড়া এবং তার গায়ে অপূর্ব কারুকাজ শীশ মহলকে রমণীয় করে তুলেছিল। শীশ মহলের প্রবেশ পথে সামনে ছিল একটি প্রশস্ত চত্বর। পুরো চত্বরটি

মোটা কাঁচে আবৃত করলেন। তার নীচে প্রবাহিত করলেন পানির নহর। শীশ মহলের সামনে এলে যেন মনে হবে স্বচ্ছ পানির নহর পেরিয়ে মহলে ঢুকতে হবে। সাবার রাণীকে বলা হলো এই সুরম্য প্রাসাদে আপনাকে থাকতে হবে। রাণী প্রাসাদের সামনে এসে চত্বরে প্রবাহিত পানির নহর দেখে মনে করলেন পানি পার হয়ে মহলে প্রবেশ করতে হবে। তাই তিনি কাপড় হাঁটুর দিকে টেনে তুলতে লাগলেন। হযরত সুলাইমান বললেন, না, না, এর দরকার নেই। এখানে পানি নেই। এ সারা মহল এবং এ চত্বর সব স্ফটিক পাথরের তৈরি।

রাণীর ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। তিনি সব কিছুকে আর স্বাভাবিকভাবে দেখতে পারলেন না। এবার তাঁর অন্তরের অনুভূতি এবং সত্য ও মিথ্যাকে যাচাই করার বুদ্ধিবৃত্তি জেগে উঠলো। তিনি ভাবতে লাগলেন এ পর্যন্ত যাকিছু অস্বাভাবিক বিষয় তিনি দেখে এসেছেন সবগুলো নিছক এই মহাপরাক্রমশালী বাদশার অসাধারণ শক্তির প্রকাশ নয় বরং এর পেছনে রয়েছে এমন এক অসীম ক্ষমতাশালী সত্তার শক্তি-প্রাচুর্য যিনি সূর্য, চন্দ্র এবং সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র পরিচালক এবং সুলাইমান আমাকে তাঁর নিজের নয় বরং এই মহাশক্তিধর সত্তার অনুগত করতে চান।

রাণীর মনে এ চিন্তার উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তিনি লজ্জাবনত মস্তকে হযরত সুলাইমানের সামনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে অংগীকার করলেন ঃ "হে মহান প্রতিপালক, রাব্বুল আলামীন ! আজ পর্যন্ত আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সত্তার পূজা করে আমি নিজের ওপর বড়ই জুলুম করেছি। কিন্তু এখন আমি সুলাইমানের সাথে মিলে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছি, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।"

সাবার রাণী হয়ে গেলেন একজন খাটি মু'মিন ও মুসলিম।

মহানুভব নবী

মুসলমানরা নাকি মক্কা আক্রমণ করবে। তারা এবার অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে যুদ্ধ করে তাদেরকে দমানো গেল না। জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন কোনো কিছু করেই ঠেকানো গেলে না তাদেরকে। দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তাদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবু সুফিয়ান পেরেশান হয়ে গেলেন। সাহসী, বৃদ্ধ আবু সুফিয়ানের মনের এক কোণে যেন একটু ভয় ভয় ভাব জেগে উঠল। "যে গুপ্তচর বাহিনীকে মদীনায় পাঠিয়েছিলাম মুসলমানদের রণ প্রস্তুতির খবর আনার জন্য তারাও তো ফিরে এলো না। তবে কি ধরা পড়ে গেল তারা ?" এমনি বহু রকমের সন্দেহ ও আশংকা আবু সুফিয়ানের মনে ধীরে ধীরে যেন পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠছিল। নিশ্চিন্তে আর বসে থাকতে পারলেন না তিনি। সঙ্গীদেরকে বললেন, চলতো একটু মক্কার বাইরে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি।

হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বের হয়ে পড়লেন।

মক্কার বাইরে বের হয়ে অনেক দূরে দেখতে পেলেন আগুন জ্বলছে। কিন্তু আগুন তো এক জায়গায় নয়। দূরে দূরে কাছাকাছি একের পর এক সারি সারি আগুন জ্বলছে।

'হাকীম বলতে পারো কারা, আগুন জ্বালাচ্ছে ? মক্কার এতগুলো গোত্র শহরের বাইরে কি করতে গিয়েছিল ?' আবু সুফিয়ানের প্রশ্নের মধ্যে অস্থিরতা ও আশংকার ভাব লুকিয়ে ছিল। 'রাতের অন্ধকারে এত দূর থেকে ঠাহর করাও তো যায় না কারা ওরা।' হাকীম ভয়ে ভয়ে বললেন।

বুদাইল বললেন, 'তবে ওটাতো আরাফাতের মাঠ। ওখানে মক্কার লোকেরা এতগুলো তাঁবু গাড়তে যাবে কেন ? নিশ্চয়ই ওরা বাইরের লোক।'

মনে মনে ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনজনই। কি জানি যে আশংকা করছেন তারা সেটাই যদি সত্য হয়। তাহলে আর কোনো আশা নেই। তিনজন এগিয়ে গেলেন তিন দিক দিয়ে। তারা যতই সামনে বাড়ছিলেন ততই দেখছিলেন অপরিচিত জনদের মুখ। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা মুসলমান। আবু সুফিয়ানের আর সন্দেহ রইলো না। এরা সবাই মুসলমান, সবাই এসেছে মদীনা থেকে। এখন তার বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগলো। না জেনে অতি আগ্রহে একেবারে ভিতরে এসে গিয়েছিলেন। এখান থেকে বাইরে বের হয়ে যাওয়াই কঠিন ব্যাপার। যদি কেউ চিনে ফেলে তাহলে হয়তো প্রাণেই মেরে ফেলবে। হাতে কোনো অস্ত্রও নেই যে, লড়াই করে মোকাবিলা করবেন। এতবড় শত্রুকে কি কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারে ? মুহাম্মদের তো তিনি প্রাণের শত্রু। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অনেক প্রাণ প্রিয় সঙ্গীকে হত্যা করেছেন। এমনিক তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন।

মক্কার সেই রাতটির কথা আবু সুফিয়ানের মনে পড়লো। মুহাম্মদকে (স) হত্যা করার জন্য কুরাইশদের সকল গোত্রের সরদাররা রাতে তার বাড়ির চারদিকে ঘেরাও করলো। সকালে বাইরে বের হবার সাথে সাথে সবাই এক সাথে তার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে এই ছিল তাদের মতলব। তার ফলে তাকে হত্যা করার দোষ কোনো একটি বিশেষ গোত্রের ওপর পড়বে না। সবাই একযোগে হবে সে জন্য দায়ী। কিন্তু সকালে তার বাইরে আসায় বিলম্ব দেখে সবাই হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে দেখল বিছানায় শায়িত আলী। মুহাম্মদ (স) নেই। উহ ! কি লোকসানটাই না হয়েছিল।

সেদিন আল্লাহ মুহাম্মদকে (স) বাঁচিয়ে ছিলেন। তাইতো আজ তিনি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছেন মক্কা জয় করতে।

এসব সাত সতেরো ভাবছিলেন আবু সুফিয়ান। এমন সময় প্রিয় নবীর (স) দেহরক্ষী বাহিনীর লোকেরা চিনে ফেলল তাকে। তারা পাকড়াও করে তাকে নিয়ে গেলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে।

ভেবেছিলেন এই বুঝি তাকে হত্যা করার হুকুম দেয়া হবে। কিন্তু না কিছুই হলো না। বরং অনেক সদয় ব্যবহার করা হলো তার সাথে। অবাক হয়ে গেলেন আবু সুফিয়ান। এতবড় শত্রুকে কেউ এভাবে ছেড়ে দিতে পারে। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, মুসলমানদের এই শক্তির সামনে আর কুরাইশদের কেন সমগ্র আরব দেশেরই দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ইসলামের সত্যতা এখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ (স) তাঁর রসূল।

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণে প্রিয় নবী (স) খুব খুশি হলেন। সকালে যখন সেনাদল মক্কার দিকে রওয়ানা হচ্ছিল প্রিয় নবী (স) চাচা আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ

'আবু সুফিয়ানকে অশ্বারোহী সেনাদের চলার পথের পাশে নিয়ে দাঁড়ান।'

কাজেই আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে লাগল মুসলমানদের এক একটি সেনাদল। তিনি তাদের শক্তি অনুভব করতে লাগলেন।

'এরা কারা ?' আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

'এরা গিফার গোত্রের লোক।' আব্বাস জবাব দিলেন।

'এরা কারা ?'

'এরা জুহাইনা গোত্রের।'

'এরা কারা?'

'এরা সুলাইম গোত্রের।'

শেষে এল একটি বিরাট বাহিনী। এর আগে এতবড় এত বিপুল সংখ্যক সেনাদল আর দেখা যায়নি। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন : 'এরা কারা?'

'এরা আনসার সেনাদল।' আব্বাস জবাব দিলেন। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আনসার সেনাদলের সেনাপতি। তার হাতে ছিল আনসারদের পতাকা। আবু সুফিয়ানকে দেখে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন :

হে আবু সুফিয়ান ! আজ হবে ঘোরতর যুদ্ধ। আজ কা'বা ঘরকে হালাল করে দেয়া হয়েছে।' আবু সুফিয়ান ভয় পেয়ে গেলেন।

তিনি হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন : আব্বাস ! বুঝি কুরাইশদের ধ্বংসের দিন এসে গেছে। আজ তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।'

এরপর এলো আর একটি সেনাদল। এটি ছিল সবচেয়ে ছোট। এর মধ্যে ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নিকটতম সাহাবীগণ। এ দলের পতাকা বহন করে চলছিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তিনি তাকে বললেন :

'আপনি জানেন সা'দ ইবনে উবাদা কি বলে গেল?'

'কি বলল সা'দ?' প্রিয় নবী জিজ্ঞেস করলেন।

আবু সুফিয়ান সা'দ ইবনে উবাদার কথাগুলো আবার শুনিয়ে দিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

'সা'দ ভুল বলেছে। বরং আজকের দিন হচ্ছে এমন দিন যে দিন কা'বা ঘরের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেন, 'আবু সুফিয়ান ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মক্কায় মুসলমানদেরও ভাই ভাতিজা এবং আত্মীয়-স্বজন

আছে। মুহাজিরদের ঘর বাড়িও তো সেখানে আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেখানে আছে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সম্মানিত গৃহ।

'আবু সুফিয়ান ! আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে চলে যান এবং তাদেরকে বলুন ঃ

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করবেন একজন ভদ্র ও সুবিবেচক ভাই হিসেবে। আজ কেউ বিজয়ী কেউ বিজিত নয়। আজ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের দিন। শান্তি, নিরাপত্তা ও উদ্বেগহীনতার দিন।'

'আজ যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে।'

যে কাবা গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে।'

যে নিজের গৃহের দরজা বন্ধ করে নেবে সে নিরাপদ হবে।

আবু সুফিয়ান এই প্রীতি ও সৌহার্দের বাণী শুনেই খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন। তিনি এক দৌড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। উদ্বিগ্ন, ভীত, সন্ত্রস্ত জনতাকে শুনালেন অভয় বাণী। নারী, বৃদ্ধ, শিশু, যুবক সবাই নিশ্চিন্ত হলো। মুসলিম সেনাদল সুশৃঙ্খল ও ভদ্রভাবে শহরে প্রবেশ করলো। যখন সবদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

হে কুরাইশরা ! তোমরা কি জান তোমাদের সাথে আমি কি ব্যবহার করবো ?'

সবাই এক বাক্যে বললো ঃ

'ভালো ব্যবহার করবেন। আপনি ভালো ভদ্র ভাই এবং ভালো ভদ্র ভাইয়ের সন্তান।'

তিনি বললেন ঃ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই। কোনো ব্যাপারে তোমাদের পাকড়াও করা হবে না। যাও, তোমরা সবাই স্বাধীন।'

এরা কারা ছিল ? এরা বিদ্রোহ করেছিল আল্লাহর বিরুদ্ধে। এরা ছিল রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানের দুশমন। এরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। তাঁর ও তাঁর সাথীদের ওপর জুলুম-অত্যাচার

করেছিল। তাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রাণপণে লড়াই করেছিল। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা তাঁর প্রতি নির্দয়ভাবে পাথর বর্ষণ করে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলো। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা তাঁর নিরপরাধ সাহাবীদেরকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর শায়িত করে তাদের ওপর বিশাল প্রস্তর খণ্ড চাপিয়ে দিতো। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা গরম লোহার শলাকা পুড়িয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্বল ও রুগ্ন সাহাবীদের শরীরে দাগ দিতো।

একদিকে ছিল এসব নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং অন্যদিকে এ নজিরবিহীন ক্ষমা, প্রেম প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব।

দুনিয়ার ইতিহাসে আজো এর দ্বিতীয় কোনো নজির নেই।